একুশে ফেব্রুয়ারী

সম্পাদনা : হাসান হাফিজুর রহমান

নবজাতক প্রকাশন

৬ এন্টনীবাগান লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪:

প্রকাশক

মজহারুল ইসলাম

৬ এন্টনীবাগান লেন

কলিকাতা ৯

মুদ্রক

শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার

১২১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ শিল্পী

খালেদ চৌধুরী

মূল্য : নয় টাকা

যে অমর দেশবাসীর মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছেন

একুশের শহীদেরা,

যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে

একুশের প্রতিজ্ঞা

তাঁদের উদ্দেশ্যে
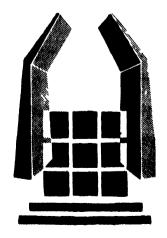
এ বাংলায় সে-একুশ কেন ?

পূর্ব বাংলার নব জাগৃতির স্মৃতি-সূত্রে একুশে ফেব্রুয়ারীর একটা ইতিহাসগত তাৎপর্য আছে। কোনো জাতির জীবনে কোনো ঘটনাই পরম্পর বিচ্ছিন্ন কোনো একক অভিধা নয়। আজকের 'বাংলা দেশ' প্রতিষ্ঠার যে গণ জাগরণে সারা পূর্ব বাংলা টালমাটাল সেই উন্মেষ-চেতনার ভিত কিন্তু প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল আজ থেকে দু' দশক আগে ১৯৪৮ এ ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তান সৃষ্টির অন্যতম স্বার্থ-প্রবক্তা কায়েদে আজমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ বিবোধিতায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির তমদ্দুন-ভাবনাব মোহগ্রস্ত আবেগ তখন থেকেই কুয়াশা-কাটা চেতনায় ক্রমান্বয়েই সঞ্চারিত হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনে। পাকিস্তান-ভাবনাটাই যে পুরোপুবি একটা প্রতিক্রিয়াশীলতা জনিত স্বার্থ প্রণোদনা— এই মহান উপলব্ধিতে মানুষ উচ্চকিত হতে শুরু করলো। সেই মোহগ্রস্ত আবেগ-চেতনা বিপ্লবমুখীন অভিঘাতে ফেটে পডলো সেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শো বাহান্নোর মাহেন্দ্রক্ষণে।

একুশের সেই দাবি যদিও সাংস্কৃতিক চেতনার মূল প্রেরণা তবুও সামগ্রিক অর্থে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক স্বার্থ-চক্রান্তের বিকারগ্রস্ততায় বিক্ষুব্ধ মানুষের সে আন্দোলন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছেড়ে বৃহত্তর রাজনীতিক চেতনাপ্রবাহের দ্যোতনা সৃষ্টি করলো।

তাই একুশে ফেব্রুয়ারীর তাৎপর্য একটা ভিন্নতর দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিত বয়ে আনে যাকে ইতিহাস চেতনার সংজ্ঞায় নাম দিতে পারি পূর্ব বাংলার রেনেঁসা বা নব জাগৃতি।

একুশের এ আন্দোলন আপাতঃ বিচারে মাতৃভাষার স্ব-শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক অভিঘাত মনে হলেও ব্যাপকতর বিচারে এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে ইতিহাসাশ্রয়ী এক নতুন মানসিকতার জন্ম দেয়, যেখানে ইসলামী তমদ্দুন ভাবনার সমূহ মূলোৎপাটনেব মধ্য দিয়ে মানুষ অতীতের সংকীর্ণতামুক্ত সচেতনতায় এক নতুন সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয় যে, মুসলমান একটি জাতি নয়, বাঙালীই একটি জাতি। মুসলমান একটি ধর্মীয়

সম্প্রদায় মাত্র। আর এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের জন্ম তা অপ্রিয়, অমূলক ও বাস্তবতাহীন প্ররোচনা মাত্র। ভাষা আন্দোলনের ঘটনার মধ্য দিয়ে এই যে বস্তুতান্ত্রিক চেতনার দ্যোতনা তা কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্যে বিশ শতকের পৃথিবীর ইতিহাসকে সুচিহ্নিত করে।

কেননা, ইতোপূর্বের উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে যে রেনেসাঁর জন্ম তার ইতিহাস সূত্রের ব্যাখ্যায় দেখা যায় সামন্ত ব্যবস্থার ভাঙনের মধ্য দিয়ে সেই জাগৃতি-ভাবনা সমাজের উপর তলার মুষ্টিমেয় কিছু বুদ্ধিজীবী ভাবনাব মধ্যে স্পর্শকাতরতা সৃষ্টি করে। অপর পক্ষে পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে এই নব জাগৃতির নায়ক শুধু কিছু উপরিস্থলের বুদ্ধিজীবীরাই নয়, এব নায়ক সমাজের নিম্নসারির কৃষক, মজুর, খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত মানুষেরা। ইউরোপে যে নব জাগৃতির শুরু উপর তলা থেকে, পূর্ব বাংলায় সেই নব জাগৃতির শুরু নিচুর তলার মানুষের মধ্য থেকে। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের গুণগত স্বাতন্ত্র এখানেই।

দ্বিতীয়তঃ ভাষা আন্দোলন যদি বলি একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অঙ্গ তাহলে এও বলা যায় কোনো দেশেই রাজনীতিক আন্দোলনের বিপ্লবমুখীন সমাধা সাধিত না হলে শোষণ ব্যবস্থা সমন্বিত সমাজ ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন কোনো বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এ দিক থেকেও পূর্ব বাংলা স্বতন্ত্র ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যে বুর্জোয়া জমিদারতন্ত্রের শোষণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বাজনৈতিক ওলোটপালট জাতীয় পরিবর্তন সমাধার আগেই এখানে এমন একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সফল স্বীকৃতি তারা আদায় কবেছেন।

তৃতীয়তঃ ভাষা আন্দোলন একটি জাতীয় ভাবনার প্রচণ্ড আবেগতাড়িত বিস্ফোরণ হলেও আন্দোলনের নিজস্ব গতিতে তা এমন এক রাজনীতি-সচেতনতার জন্ম দিয়েছে যা পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতি-চেতনার পটভূমিতে জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রাধিকার প্রশ্নের সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে যূথবদ্ধ করার প্রেরণায় উত্তীর্ণ করেছে। ৫ে আত্ম নিয়ন্ত্রাধিকার প্রশ্নের মুখোমুখী লড়াইয়ে আজ 'পূর্ব বাংলা' চেতনা 'বাংলা দেশ' চেতনার অতুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী শীতলক্ষ্মার তীরে তীরে যে ঢেউ আজ উত্তাল আবেগে প্লাবিত প্রান্তর তার ঐতিহাসিক জন্ম সূত্র এই একুশের অঙ্গীকারেই

একদা সমর্পিত হয়েছিল বলেই ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য এতো ব্যাপক-বিস্তারে পূর্ব বাংলার জাগ্রত চেতনার চিত্রে গভীর রেখায় অঙ্কিত।

আর এ বাংলায় এই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ আজ যে তাৎপর্যতাড়না সৃষ্টি করে তার কারণ হলো অন্তর প্রকৃতির বিচারে দু' বাংলার সমাজ ব্যবস্থা বিভাগোত্তর কালে ফর্মের দিক থেকে ভিন্ন হলেও কন্‌টেণ্টগত চরিত্রে দু'য়ের মধ্যে কোনো ফারাক নেই।

এ বাংলায় যেমন তথাকথিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনের খোলসে বুর্জোয়া-জমিদার তন্ত্রেরই যূপকাষ্ঠে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থার সূত্রে উৎপীড়িত, তেমনি ও বাংলাতেও সামরিক একনায়কতন্ত্র শাসনান্ত্রিক প্রধান হলেও তা বুর্জোয়া-জমিদারতন্ত্রেরই শ্রেণী স্বার্থের দাসত্বে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই স্বভাবতই এ বাংলার মতোই ও বাংলারও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘিষ্ঠ শোষক শ্রেণীর কাঠগড়ায় কড়াবাঁধা আসামী।

সুতরাং সামাজিক শোষণ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বিচারে দু' বাংলার মধ্যে কোনো আসমান-জমিন ফারাক খোঁজার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সবচাইতে বড়ো কথা দু' বাংলার এই ভৌগোলিক শবব্যবচ্ছেদ জনসাধারণের সামাজিক উন্নয়নের কোনো মহান উদ্দেশ্য সাধনে সাধিত হয়নি। এই ভাগ-বাঁটোয়ারা প্রাক স্বাধীনতা কালের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের দুই শরীকের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ চরিতার্থতার উস্কানী-উন্মাদনায় সংঘটিত। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে সেই জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া-স্বার্থের গাঁটছড়ার এক কলংকিত-ইতিহাস হলো এই দেশ বিভাগের ঘটনা। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে একটি জাতির আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারের তাৎপর্যকে অস্বীকার করে ধর্মীয় উন্মাদনার সহজ সূত্রে একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা ভৌগলিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির অপপ্রয়াসে একটি জাতির ইতিহাস-মানসিকতাকে যে ভিন্ন করা যায় না আজকের গণ-আন্দোলন সেই সমাজবাস্তবই প্রমাণিত করে।

তাই দু' বাংলার সূতিকা-সূত্রের সম্পর্কেই দু' বাংলার মানসিকতা অভিন্ন।

সুতরাং ও বাংলায় রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংঘাতময়তা এ বাংলার গ্রন্থি-চেতনায় একই সূত্রে সম্পৃক্ত।

আজকের পূর্ব বাংলার আন্দোলন যে বিস্তৃতি-চেতনার বিস্ফোরণে সামরিক একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখোমুখী সংঘর্ষে সশস্ত্র অবয়ব-আশ্রিত তার সমূহ শিক্ষা

তাই আমাদের এ বাংলাতেও সেই অমোঘ ও অম্লান সত্যের স্বীকৃতি দাবি করে।

শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের সংগ্রাম আজ দু' বাংলারই স্বভাব ধর্ম। তাই ঐতিহাসিক অঙ্গীকারত্বের অবশ্যম্ভাবী তাৎপর্যে ও বাংলার আন্দোলনগত রণনীতি ও রণকৌশলের চেতনাকে সঠিক পরিমাপে এ বাংলায় প্রসারিত করার প্রয়োজন অপরিসীম।

তাই ও বাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস চেতনা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা এ বাংলার পক্ষে শুধু অপরাধ নয়, একটি ক্ষমাহীন পাপ। প্রকাশক মজহারুল ইসলাম ও তার সহযোগী বন্ধু কামাল আমেদ এ পাপস্খালনের যে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছেন তা সুসঙ্গত ভাবেই তাই অভিনন্দনযোগ্য।

সুখের কথা, এ বাংলার এমন কিছু প্রকাশক দু' বাংলার সংস্কৃতি-প্রবাহের সেই অভিন্ন সুরটি এ বাংলার পাঠকদের কাছে তুলে ধরার, অনেক দেরীতে হলেও, ব্যবসায়িক লাভ-খতিয়ানের স্বার্থ প্রচেষ্টা ভুলে যে মহান প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন তা আশার উদ্রেক করে। কেন না দুই পারে দুই বাংলাদেশ, মাঝেতে তার বাধার প্রাচীর দৃঢ় হলেও একই সংস্কৃতির সেই অবিচ্ছিন্ন ধারায় আমরা পরস্পরের আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করার ব্যগ্রতায় আজ কম্প্রবক্ষ। হুগলীর জলতরঙ্গে আজ পদ্মার কানাকানি মিলেমিশে একাকার দুরন্ত আবেগে। এমনই সে দিনের আগমনী গান আজ বাংলার খা খা মাঠে সুর তোলে একই প্রশ্নের অসহ্য বিরহ কাতরতায়—নিজ দেশে পরবাসী, কাইন্দা মরুম ক্যান? শেষের সে-দিন আর বেশি দূরে নয় যখন ভৌগোলিক বিভাজন-রেখার সেই কৃত্রিম বেড়া ভাঙচুর করে ইতিহাসের নতুন ইঙ্গিতেই আমি আমার একান্ত ভাইয়ের মুখের সে প্রশান্ত হাসি দেখতে পাবো—কেন না, কবির কথায় সেই প্রশান্ত হাসির না-ই তো মানবতা।

জিয়াদ আলি

একুশে ফেব্রুয়ারী

কামাল আমেদ

একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তের সম্ভাবনা নিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এমনি এক যুগান্তকারী দিন।

শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। দুনিয়ার মানুষ হতচকিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছে মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের জনতার দুর্জয় প্রতিরোধের শক্তিতে, শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে ভাষার দাবীতে পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণদের এই বিশ্ব ঐতিহাসিক আত্মত্যাগে। জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য দুনিয়াজোড়া মানুষের যুগ যুগব্যাপী যে সংগ্রাম, একুশে ফেব্রুয়ারী তাকে এক নতুন চেতনায় উন্নীত করেছে।

মেকি আজাদীর রঙিন ছটা আর উজ্জ্বল নতুন দিনের সোনালী স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে—জাতির জীবনে, সমগ্র দেশের বুকে নেমে এসেছে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কালো বিভীষিকা। সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর প্রতিক্রিয়ার দানবীয় নিষ্পেষণে দেশের অর্থ-নৈতিক জীবন পংগু, শিক্ষার অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা বিপর্যস্ত, গণতন্ত্র নির্বাসিত। আর এই নিঃসীম অন্ধকারের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জনতার জীবন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন।

এমনি দুর্দিনে এক ঝলক আশীর্বাদের আলোর মতোই এলো একুশে ফেব্রুয়ারী। দিনে দিনে যে বিপুল বিক্ষোভ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে

জমেছিল মানুষের মনে মনে, শহীদের পবিত্র রক্তের স্পর্শে যেন কোন্ মন্ত্রগুণে তার বাঁধ গেল ভেঙ্গে—উচ্ছল জোয়ারের কলধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশ জুড়ে।

শহীদের আত্মদান সমগ্র আন্দোলনকে এমন এক পবিত্র মহিমায় মণ্ডিত করল যে, দেশের আপামর সাধারণ মানুষ প্রতিক্রিয়ার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এই আন্দোলনে সামিল হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করল না। প্রথম দিকে ছাত্র এবং শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে ভাষা ও সংস্কৃতির এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও, একুশে ফেব্রুয়ারী তাকে ছড়িয়ে দিল দেশের আনাচে-কানাচে, গ্রাম-গ্রামান্তরের সুদূরতম প্রান্তে। শহীদের রক্ত ডাক দিল দেশজোড়া কিষাণের শক্তিকে, মধ্যবিত্তের শক্তিকে—দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষকে। আর এই বিপুল জমায়েতের সামনে পড়ে সাময়িকভাবে হলেও পিছু হটতে বাধ্য হল প্রতিক্রিয়ার শক্তি।

একুশে ফেব্রুয়ারীর পেছনে দেশজোড়া এই বিপুল জমায়েত সম্ভব হয়েছিল, কেননা এ-তো শুধু ভাষা আর সংস্কৃতির প্রশ্নই ছিল না, এর সাথে জড়িয়ে ছিল আমাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী, বাঙালীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রশ্নও। জাতিগত এবং আঞ্চলিক অত্যাচার ও শোষণের চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কায়দার এই ষড়যন্ত্রকে রুখে দাঁড়াতে পূর্ব-পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর দেশপ্রেমিক মানুষ তাই কোনো ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠাবোধ করেনি।

একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব-পাকিস্তানে শুধু গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই জোয়ার সৃষ্টি করেনি, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এনেছে

দিগন্ত-বিসারী প্লাবন। প্রতিক্রিয়ার নির্মম হিংসা ও লোভের আগুন থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য দেশ জুড়ে জনতার যে দুর্জয় ঐক্য গড়ে উঠেছে, পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি এই দরদ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের নতুন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে—আপামর মানুষের মনে আমাদের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিকে নতুন সম্ভাবনার পথে নিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রতিক্রিয়ার শক্তি জনতার বিপুল ঐক্যের সামনে সাময়িকভাবে পিছু হট্‌লেও আজ আবার নতুন করে তার বিভেদ এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী জনতার মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, জাতিসমূহের গণতান্ত্রিক অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার, স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার হরণ করে, অত্যাচার শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থের অধিকারকে পাকাপাকি করার আয়োজন করছে।

কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব-পাকিস্তানের জনতাকে পথ দেখিয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারী দেখিয়েছে জনতার সকল শ্রেণীর প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হলে প্রতিক্রিয়ার সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পরাজিত করা সম্ভব।

একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রথম ব্যাপক পশ্চাদপসরণের সূচনা করেছে। সূচনা করেছে জনতার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়াভিযান এবং সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক নব জাগরণের।

একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন।

একুশে ফেব্রুয়ারীকে সালাম!

পূর্ব-পাকিস্তানের নব-জাগ্রত জনতার বিজয়াভিযানকে সালাম!

সকল ভাষার সমান মর্যাদা

আলী আশরাফ

২১ শে ফেব্রুয়ারী ঘুরে এসেছে। এক বছর পর ঘুরে এসেছে আবার সেই পবিত্র দিন—যে-দিন নিজ মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকারের জন্য পূর্ববঙ্গের নও-জোয়ানরা তথা সারা জনতা—নিজেদের জানমাল কোরবানি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

ভাষার অধিকারের জন্য জনগণের এই অতুলনীয় সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ অকস্মাৎ এসে হাজির হয় নি। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরই পূর্ববঙ্গে এ সংগ্রাম শুরু হয়। শুধু তাই নয়। **এ সংগ্রাম শুরু হয়েছিল যুগ যুগ আগে অবিভক্ত ভারতে।** অবিভক্ত ভারতে রাষ্ট্রের কাজ-কর্ম কোন্ ভাষায় চলবে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ নিজ নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের অধিকার পাবে কি না, তাঁর নিজ নিজ বাসভূমির (প্রদেশের) রাজকার্য নিজ নিজ ভাষায় পরিচালনা করার অধিকার পাবে কি না—প্রভৃতি প্রশ্ন বহু বছর আগেই উঠেছিল। বস্তুতঃ অবিভক্ত ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যতই প্রসার লাভ করছিল, জনগণের ভিতর গণতান্ত্রিক চেতনার যতই বিকাশ হচ্ছিল, বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের ভিতর নিজ নিজ জাতীয় অধিকার বোধও ততই বেড়ে উঠছিল। অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি একথা উপলব্ধি করছিল যে, নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষা লাভ করা ও রাষ্ট্রকার্য পরিচালনা করার অধিকার তাদের জাতীয় মুক্তির অপরিহার্য শর্ত, তাই জাতীয় মুক্তির অন্যতম মৌলিক অধিকাররূপেই বিভিন্ন ভাষার দাবী অবিভক্ত ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিশেষ জোরের সঙ্গে দেখা দিয়েছিল।

তদানীন্তন শাসকচক্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জনগণের ভাষার দাবী মেনে নেয় নি। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী জোর করে চাপিয়ে দিল যে, ইংরেজীই হবে একমাত্র 'রাষ্ট্রভাষা'। **'রাষ্ট্রভাষা' কথাটাও স্বৈরাচারী-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ফলরূপেই প্রচলিত হয়ে আসছে।** অবিভক্ত ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পত্তনের পূর্বে রাষ্ট্রব্যবস্থা যখন ছিল সামন্তযুগীয় রাজতন্ত্র, যখন শাসকগোষ্ঠী দেশের জনসাধারণ থেকে আলাদা ও উচ্চতর জীব হিসেবে একটা বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার সম্পন্ন শ্রেণী (Privileged class) বলে নিজেদের জাহির করতো, তখন রাজদরবারে ব্যবহৃত হত একটি বিশেষ ভাষা (court Language) যে-ভাষা অধিকাংশ জনসাধারণের ভাষা হত না। যেমন, নবাবী আমলের এক সময়ে বাংলা দেশের রাজদরবারে ব্যবহৃত হত ফার্সী।

কিন্তু এ থেকে এ ধারণা করার কোন কারণ নেই যে, ফার্সী ভাষাটা একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর ভাষা। **কোন ভাষাই কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর ভাষা নয়।** এক একটি **ভাষা শ্রেণী নির্বিশেষে এক একটি জাতির ভাষা।** যেমন, ফার্সী ভাষা নবাবী আমলে বাংলা দেশের রাজদরবারের ভাষা হলেও আসলে এ ভাষা হলো পারস্য দেশের।

ভাষার ক্ষেত্রে এ স্বেচ্ছাচারিতা দেশ বিভাগের পরও শেষ হলো না। দেশ বিভাগের পর **রাষ্ট্র-ক্ষমতা লীগ নেতাদের হাতে 'হস্তান্তর'** হওয়ার মধ্য দিয়ে যেমন **সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ শাসন পরোক্ষ শাসনে পরিণত হলো,** ঠিক তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে আগের স্বেচ্ছাচারিতা ভোল বদলিয়ে নতুন স্বেচ্ছাচারিতার রূপ গ্রহণ করলো। লীগ নেতারা ঘোষণা করলেন—"উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" স্বৈরাচারী লীগ শাসন পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষী **জনগণের ভাষাগুলিকে উপেক্ষা করে** একমাত্র **উর্দুকেই রাষ্ট্রে বিশেষ মর্যাদা দিতে চাইলেন।**

এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধেই অতীতের সেই ভাষার লড়াই আবার জেগে উঠলো নতুন ভাবে নতুন শক্তিতে। সে লড়াই একটা বিশেষ **গৌরবময় রূপ ধারণ করেছিল ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে।** তাই, ২১শে ফেব্রুয়ারী শুধু বিভাগোত্তরকালের ইতিহাসেই নয়, এ-পবিত্র দিনটি আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

॥ ২ ॥

২১শে ফেব্রুয়ারীর সে গৌরবময় গণ-জাগরণের সামনে স্বৈরাচারী লীগ শাসনকে সাময়িকভাবে হলেও পিছু হটতে হয়েছে। তার প্রমাণ হলো যে, শাসনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে রাষ্ট্র-ভাষার প্রশ্নই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসকচক্রের এখন এ সাহস নেই যে, প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারে "উর্দ্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা।" তাই তারা চুপ করে আছে। এটা তাদের দুর্বলতার লক্ষণ।

তবে, তাদের এ নীরবতার আর একটা দিক আছে। প্রথমতঃ এ নীরবতার ফাঁকে এখনও কার্যতঃ ইংরেজী "রাষ্ট্রভাষারূপে" চালু থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ স্কুল-কলেজে উর্দ্দুকে বাধ্যতামূলক করে এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কার্য্য পরিচালনায় **উর্দ্দুভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে শাসকচক্র পেছনের দরজা দিয়ে উর্দ্দু চাপাতে চাইছে।** তৃতীয়তঃ শাসকচক্র অপেক্ষা করছে সুযোগের সন্ধানে। সুযোগ মত তারা নিজের স্বৈরাচারী রূপ নিয়ে প্রকাশ্য আসরে নেমে আসবে।

তাই, শাসকচক্রের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের হুঁশিয়ার থাকতে হবে। **মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠী হলো এ দেশের সামন্তবাদী ভূস্বামী ও মুষ্টিমেয় বড় ব্যবসায়ীর মুখপাত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক। সামন্তবাদী ভূস্বামীরা** ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই হলো **গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দুশমন।** এর কোন ভাষাভাষী জনগণের

গণতান্ত্রিক অধিকার, ভাষার অধিকার প্রভৃতি কোন অধিকারই স্বীকার করতে চায় না। সে জন্যই লীগ শাসনে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের রুটি, রুজির মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন পর্যুদস্ত হচ্ছে, তেমনি ভাষার অধিকারও পদদলিত হচ্ছে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তানের মুসলিম লীগ শাসকচক্র প্রধানতঃ উর্দ্দুভাষী। সে জন্য তারা অন্যান্য ভাষাকে পদদলিত করে উর্দ্দুকেই 'রাষ্ট্রভাষা' করতে চায়। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু এরা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী এবং রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উপর বৃটিশ ও মার্কিন প্রভাব রয়েছে ও এরা রাখতে চাচ্ছে, সেজন্য এরা "আরও ২০ বৎসর রাষ্ট্রভাষা রূপে" ইংরেজীকেও চালু রাখার জন্য ওকালতি করছে। অর্থাৎ উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষা" করেও নানা যুক্তি-ওজর দেখিয়ে তার সঙ্গে ইংরেজীকেও "রাষ্ট্র-ভাষার" মর্যাদা দিয়ে রাখা এই স্বৈরাচারী শাসকক্রের অভিসন্ধি। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রকার্যে জনগণকে অংশ গ্রহণ করতে না দেয়ার জন্যও জনগণকে অশিক্ষিত মূর্খ রেখে তাদের উপর শোষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই স্বৈরাচারী পথ গ্রহণ করেছে।

মুসলিম লীগ শাসকচক্রের আসল শ্রেণীরূপ ও তার অভিসন্ধি বুঝে তার বিরুদ্ধে আমাদের "সকলের ভাষার মর্যাদার জন্য" সচেতন প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

॥ ৩ ॥

সুখের বিষয় সে প্রচেষ্টা আজও চলছে। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে আমরা ভুলি নি, ভুলবোও না।

তবে, আমাদের ভাষার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ভাবে দাবীটা বেরিয়ে আসছে সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার।

ভাষা আন্দোলনের মূল আওয়াজ উঠেছে "অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" গত ভাষা আন্দোলনের সময় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা

সংগ্রাম পরিষদের কোন কোন নেতা মত প্রকাশ করেছিলেন যে, আন্দোলনের মূল আওয়াজ হবে—"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।" সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য কয়েকজন সভ্য সে আওয়াজের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ওরূপ আওয়াজে লোকে ভুল বুঝবে যে, আমরা 'শুধু' বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাই। তাঁরা বলেছিলেন যে, 'রাষ্ট্রে জনগণের সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই,'—এই নীতি অনুসারে আন্দোলন চলুক। তাঁদের সে বক্তব্য গ্রাহ্য হয় নি। অপর দিকে, "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"—এ আওয়াজও গ্রাহ্য হলো না। "অন্যতম" শব্দটি জুড়ে দিয়ে একটা আপোষরফা হলো। সে থেকে আন্দোলনের আওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে "অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

এ আওয়াজের আজ একটি বিশেষ ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। অনেক গণতন্ত্রকামী মনে করেছেন, এর অর্থ হলো—বাংলা ও উর্দ্দু এ দুটি ভাষা পাকিস্তানের "রাষ্ট্রভাষা" হবে। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও তার নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রকাশ্যে ওরূপ দাবী করছেন। আজাদ পাকিস্তান পার্টি ও তার নেতা সর্দার শওকাত হায়াৎ খাঁ পূর্বে পাকিস্তান গণ-পরিষদের ও ঢাকায় গণতন্ত্রীদলের সম্মেলনে বলে গেছেন, পাকিস্তানের "রাষ্ট্রভাষা" হবে বাংলা ও উর্দ্দু। ঢাকার সম্মেলনে উপস্থিত গণতন্ত্রকামী কর্মীরা ও জনতা তাঁর এ ঘোষণায় উল্লাসধ্বনি করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা সর্দ্দার শওকাত হায়াৎ খাঁকে সমর্থন করেছেন।

বলা যায় যে, পাকিস্তানের "রাষ্ট্রভাষা" হবে বাংলা ও উর্দ্দু—এ মতই বর্তমানে প্রগতিশীল মহলে প্রচলিত। এবং এ মতবাদ থেকেই দাবীও জানানো হচ্ছে যে, যেমন আওয়ামী লীগ নেতারা জানাচ্ছেন, পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেভাবে উর্দ্দুকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে, সেভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষপ্রতি-ষ্ঠানগুলিতেও বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হোক।

"অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"—এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজই আজ বিকশিত হয়ে 'বাংলা ও উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষা চাই'—এই সুস্পষ্ট আওয়াজের রূপ ধারণ করেছে। প্রগতিশীল মহল সাধারণভাবে ভাবছেন যে, এটাই হলো পাকিস্তানের "রাষ্ট্রভাষার" সমস্যা সমাধানের পথ।

॥ ৪ ॥

কিন্তু সত্যিই কি তাতে সমস্যার পরিপূর্ণ ও গণতন্ত্রসম্মত সমাধান হবে? ২১শে ফেব্রুয়ারী যে গৌরবময় সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বাংলা ও উর্দ্দু এ-দুটি ভাষা পাকিস্তানের "রাষ্ট্রভাষা" হলেই কি সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পুর্ণভাবে সফল হবে? এটাই কি গণতন্ত্র?

না, এতে সমস্যার সমাধান হবে না, এটা গণতন্ত্রও নয়। কারণ, যে নীতি অনুসারে আমরা আমাদের মাতৃভাষার অধিকার চাইছি, সে নীতি অনুসারেই অন্যান্যকেও তাঁদের ভাষার অধিকার দিতে হবে। পাকিস্তানের জনগণ শুধু বাংলা ও উর্দ্দু—এ দুটি ভাষায় কথা বলে না। পাকিস্তানে শুধু যে বাংলা ভাষাভাষী ও উর্দ্দু ভাষাভাষী জনগণই রয়েছে, তা নয়। এ রাষ্ট্রের অধীনে আরো রয়েছে সিন্ধী ভাষাভাষী, পাঞ্জাবী ভাষাভাষী, পুস্তু ভাষাভাষী, বেলুচ ভাষাভাষী ও গুজরাটি ভাষাভাষী জনগণ। **এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটি উপজাতি—যাদের রয়েছে স্থানীয় 'ডয়লেক্ট্' বা উপভাষা। মুসলিম লীগ সরকারও বাংলা, উর্দ্দু, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তু, বেলুচি ও গুজরাটি এই সাতটি ভাষাকে পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।**

বস্তুতঃ, পাকিস্তানে রয়েছে পাঁচটি প্রধান প্রধান জাতি—**বাঙ্গালী, সিন্ধী পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচি।** এঁদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট, স্থায়ী অবিচ্ছিন্ন বাসভূমি আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব একটি

অর্থনৈতিক জীবন আছে। প্রত্যেকের নিজস্ব মানসিক গঠন ও কৃষ্টি রয়েছে এবং প্রত্যেকের রয়েছে নিজ নিজ মাতৃভাষা।

মুসলিম লীগ এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে "এক জাতি, এক তমদ্দুন, এক ভাষার" প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তির অবতারণা করে উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষা" করতে চাইছেন।

এই পরিস্থিতিতে যদি গণতন্ত্রকামীরাও শুধু বাংলা ও উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষা" করতে চান, তাহলে সিন্ধীভাষী পুস্তুভাষী, পাঞ্জাবীভাষী ও গুজরাটিভাষী জনগণের উপর ঐ দু'টি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে। **এটাও হবে স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র বিরোধী।** কাজেই; "বাংলা ও উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষা হোক" এ দাবী কখনই পরিপূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত নয়। "অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"—এই দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজ, যে আওয়াজ থেকেই শুধু বাংলা ও উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষা" করার দাবী এসেছে, **সে আওয়াজ আজ পরিত্যাজ্য।** আন্দোলনের প্রথম স্তরে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবীর অভিব্যক্তিরূপে সে আওয়াজ প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু মহান ২১শে ফেব্রুয়ারীর এক বছর পর, যখন জনগণের অভিজ্ঞতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা আরো বেড়ে গেছে, তখন আন্দোলনের মূল দাবী রূপে ঐ দ্ব্যর্থবোধক আওয়াজের কোন সার্থকতা নেই। বরং সে আওয়াজ আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে বাধা হচ্ছে। তার প্রমাণ হলো, সে আওয়াজ সিন্ধীভাষী, পুস্তুভাষী প্রভৃতি জাতির গণতান্ত্রিক দাবীকে আমল না দিয়ে শুধু বাংলা ও উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষার" আসনে বসাতে চাইছে। এতে ভাষা আন্দোলনের পিছনে সিন্ধিভাষী, পুস্তুভাষী, বেলুচিভাষী, পাঞ্জাবীভাষী প্রভৃতি সারা পাকিস্তানের সাধারণ জনতাকে সমাবেশ করা যাচ্ছে না। বরং তাঁরা এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠবেন। **পূর্ববঙ্গে উর্দ্দুকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলাকে বাধ্যতামূলক করার দাবীও অগণতান্ত্রিক।** কোন ভাষাভাষী জনগণের উপর অন্য ভাষাকে বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়াটা স্বৈরাচারের অভিব্যক্তি। এ

ভাবে, এক ভাষা অপরের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করলে জনগণের শিক্ষা ব্যাহত হয় ও জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হয়। পূর্ব বঙ্গে উর্দ্দু ও পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা বাধ্যতামূলক করার আওয়াজ দিয়ে প্রকৃতপক্ষে জাতিগত বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এ আওয়াজও পরিত্যাজ্য।

তা ছাড়া আমাদের আন্দোলনের দাবীর ভিতর "রাষ্ট্রভাষা" শব্দটার উৎপত্তি বা মানে হলো অন্যান্য ভাষাকে বাদ দিয়ে বিশেষ কোন ভাষাকে রাষ্ট্রে বিশেষ মর্যাদা দেয়া। "রাষ্ট্রভাষা" শব্দটার সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্বৈরাচার ও বৈষম্যমূলক নীতি। কিন্তু আমরা ভাষার ক্ষেত্রে স্বৈরাচারও চাই না, বৈষম্যমূলক আচরণও চাই না। আমরা চাই ভাষার ক্ষেত্রে সকল ভাষাভাষী জনগণের পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ও সমান অধিকার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমাদের আন্দোলনের দাবী থেকে "রাষ্ট্রভাষা" শব্দটি বাদ দেওয়া প্রয়োজন। গণ-আন্দোলনের দাবীর ভেতর কোন দ্ব্যর্থবোধক বা ভুল অর্থবাহক শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়।

॥ ৫ ॥

বহু ভাষাভাষী জনগণের অর্থাৎ বহু জাতির মিলনক্ষেত্র পাকিস্তানের ভাষা সমস্যার গণতন্ত্র সম্মত সমাধানের জন্য আমাদের আন্দোলনের মূলনীতি হবে ছোট বড় প্রত্যেকটি ভাষাকে সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার দেয়া। বিভিন্ন ভাষাভাষী সাধারণ জনগণ যাতে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে ও শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পায় তার জন্য এ আন্দোলনের দাবী হবে নিম্নরূপ :

ক ॥ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সমস্ত আইন, ঘোষণা, দলিল প্রভৃতি বাংলা, উর্দ্দু, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তু ও বেলুচি ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। গুজরাটী ভাষাভাষী জনসংখ্যা যদি যথেষ্ট সংখ্যক হয়ে থাকে তবে সে ভাষায়ও প্রকাশ করতে হবে। (গুজরাটী ভাষাভাষী জন-

সংখ্যা কত তা আমার সঠিক জানা নেই বলে এ কথা লিখলাম।)
মূলনীতি হবে যে, পাকিস্তানের জনগণের প্রধান প্রধান ভাষাতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সব দলিলাদি প্রকাশ করতে হবে।

খ ॥ কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রত্যেক সভ্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবেন ও দোভাষীরা সেগুলি বিভিন্ন ভাষায় তর্জমা করে দেবেন। (জাতিসংঘে ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এ ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চলছে।)

গ ॥ প্রত্যেক ভাষাভাষী জনগণের নিজ নিজ বাসভূমির (অর্থাৎ বিভিন্ন প্রদেশের) রাষ্ট্র কার্য, আইন-আদালতের কার্য সে প্রদেশের ভাষায় চলবে। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত অন্য ভাষাভাষীরা (যেমন, পূর্ববঙ্গের উর্দ্দূভাষীরা বা পাঞ্জাবের বাঙ্গালীরা) সে সব প্রদেশের আইন আদালতে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নিজ বক্তব্য বলতে পারবে।

ঘ ॥ বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সেই সব উপজাতির ভাষায় আইন আদালতের কাজ চলবে।

ঙ ॥ ছোট-বড় প্রত্যেক ভাষাভাষী জনসমষ্টি ও বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাল্পরাও নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার অধিকার ভোগ করবে।

এই সমস্ত দাবীগুলির সারমর্ম নিয়ে আমাদের আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তিরূপে মূল শ্লোগান বা আওয়াজ হবে :

"সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই।"

২১শে ফেব্রুয়ারীর আত্মত্যাগ ও গৌরবময় কাহিনী এ মূল আওয়াজ আমাদের সামনে রেখে গেছে।

॥ ৬ ॥

কিন্তু স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকার তো বটেই, অনেক গণতন্ত্রকামীরাও এ আওয়াজ গ্রহণ করেন না। লীগ সরকারের [illegible]

ও অগণতান্ত্রিক যুক্তিগুলি সবাই জানেন। সেগুলির পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

পূর্ববঙ্গের অনেক গণতন্ত্রকামী বলে থাকেন, "সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তুভাষী প্রভৃতি জনগণ যখন তাদের নিজ নিজ ভাষার দাবী তুলছেন না, তখন আমরা সেগুলি তুলবো কেন? তাঁরা যদি তাঁদের দাবী তোলেন, তবে আমরা সেগুলি সমর্থন করবো।"

এ যুক্তি আপাত দৃষ্টিতে সঠিক ও গণতন্ত্র সম্মত বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে তা নয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। অবিভক্ত ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে একদিন বিভিন্ন প্রগতিশীল দল ও প্রতিষ্ঠান যখন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলেছিল, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বলেছিল, "ও দাবী ত সাধারণ জনগণ চায় না। ওটা মুষ্টিমেয় লোকের দাবী। সাধারণ জনগণ ওটা চাইলে আমরা বিবেচনা করতে পারি।"

এ কথা ঠিক যে, সমস্ত জনতা তখনও স্বতস্ফূর্তভাবে সাম্রাজ্য-বাদের অবসান দাবী করে নি। কিন্তু উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদীদের আমরা জবাব দিয়েছিলাম যে, 'আমবা সমস্ত দেশের জনতার প্রতিভূরূপেই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করছি। সাম্রাজ্যবাদের অবসান সমস্ত জনতার মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন বলেই আমবা সে দাবী তুলেছি।'

আমাদের এই জবাব সঠিক ছিল। সে দিনের কথা স্মরণ করে, উপরোক্ত যুক্তির ধাবক বন্ধুদের বলতে চাই, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীব শতাব্দীর নিপীড়নে অজ্ঞ পশ্চাদপদ জনতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সব ক্ষেত্রে নিজের ভালমন্দ বা দাবী-দাওয়ার কথা বুঝতে পারেনা। সে জন্যই প্রয়োজন অগ্রসর কর্মীদলের ও তাদের সংগঠনেব—বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের। এঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব হলো বৈজ্ঞানিক বিচার বুদ্ধি দিয়ে সব অবস্থা বিশ্লেষণ করে কোনটা জনতার পক্ষে ভাল-মন্দ তা স্থির করে জনতার সামনে তার দাবীদাওয়া পেশ করা ও জনতা যাতে সেটা বুঝে গ্রহণ

করতে পারে, সেজন্য জনতাকে সাহায্য করা। যে রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠান এ কাজ সফলতার সঙ্গে করতে পারে সে দল ও প্রতিষ্ঠানই হয় জনতার বন্ধু ও নেতা।

অপরদিকে যদি এই নীতি অনুসরণ করা হয় যে, "জনতা চাইলে পরে আমরা তা সমর্থন করবো" তা হলে জনতার পিছু পিছু চলা হবে এবং শাসকগোষ্ঠীকে সুবিধা দেওয়া হবে, তারা অপপ্রচার করে জনতাকে ভুল বুঝিয়ে রাখতে পারবে। অর্থাৎ অজ্ঞ, বিভ্রান্ত জনতা নিজের দাবী বুঝবে না, তা চাইবেও না এবং জনতার দাবীও হাসিল হবে না। কাজেই "জনতা চাইলে পরে আমরা সমর্থন করবো" এ যুক্তি প্রতিক্রিয়াশীল।

ভাষার ক্ষেত্রেও অবস্থাটা তাই হচ্ছে। নিপীড়িত, অজ্ঞ সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তুভাষী, বেলুচ ভাষাভাষী সাধারণ জনগণ, সেখানকার বিরাট কৃষক সমাজ আজও বুঝতে পারছে না ভাষার ক্ষেত্রে তাদের দাবী ও ন্যায্য পাওনা কোনটা। সে জন্য তারা চুপ করে আছে এবং শাসকগোষ্ঠী তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখছে।

এই পরিস্থিতিতে, সচেতন অগ্রসর গণতন্ত্রকামী কর্মীদলের বুঝতে হবে যে, যেহেতু অনগ্রসর জনতার শিক্ষার বিকাশ ও মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষতার জন্য প্রত্যেক জাতিকে তার ভাষার পরিপূর্ণ অধিকার দরকার সেহেতু সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তুভাষী, বেলুচভাষী প্রভৃতি জনগণের দাবীও তাদেরই (কর্মীদের) অগ্রণী হয়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক জাতি যদি নিজ ভাষাব অধিকার না পায় তবে তারা কখনও শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হতে পারে না, তারা রাষ্ট্রকার্যে সুষ্ঠু অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

ভাষার অধিকার প্রত্যেকটি জাতির মৌলিক জন্মগত অধিকার। ভাষার এ প্রশ্নে দাবী উঠলো, কি উঠল না সে প্রশ্ন অবান্তর। তাই "ওরা চাইলে পরে আমরা সমর্থন করবো" এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ত্যাগ করে এখনই আমাদের "সকল ভাষার সমান মর্যাদা

চাই” দাবী তুলতে হবে। এ দাবী তুললেই ভাষার আন্দোলনের পেছনে পাকিস্তানের সমস্ত ভাষাভাষী জনগণের শক্তি জমায়েত হবে। সে দুর্বার শক্তিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। এ দাবী না তুললে জনতা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকবে, আন্দোলনে জোর হবে না।

॥ ৭ ॥

“সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই”—এ দাবীর বিরুদ্ধে কোন কোন গণতন্ত্রকামী আরো দুটি যুক্তি দিয়ে থাকেন।

প্রথমতঃ তাঁরা বলেন, “সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তু প্রভৃতি অনগ্রসর ভাষা। সে জন্য এগুলিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া ঠিক নয়। এগুলি আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষা হতে পারে।”

দ্বিতীয়তঃ এতগুলি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে রাষ্ট্রের কাজে বিশৃঙ্খলা হবে। একটা বা দুটো সার্বজননীন ভাষা (Lingua Franca) চাই।”

তাঁদের এ যুক্তিগুলিও ভুল।

সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পুস্তু, বেলুচি ভাষাগুলি বাংলা ও উর্দ্দু থেকে অনগ্রসর বটে। কিন্তু ত.ः জন্য দোষী কে ?

এ কথা আবার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে, অতীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও বর্তমান মুসলিম লীগ সরকার ঐ ভাষাভাষী জনগণের ভাষাসমূহকে বিকশিত হতে দেয় নি ও দিচ্ছে না। তার জন্য কি আজ গণতন্ত্রের পূজারীরাও সে সব ভাষাকে “অনগ্রসর” বলে তাঁদের বিকাশের পথ খুলে দিতে দেবেন না ? আজও কি লাখ লাখ সিন্ধী-ভাষী, পাঞ্জাবীভাষী পুস্তুভাষী, বেলু।চভাষী, সাধারণ জনতা নিজ নিজ ভাষার অধিকার পাবে না ? সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের জনসংখ্যার অধিক সংখ্যক, বিশেষ করে, সে সব অঞ্চলের কৃষক সমাজ বাংলা বা উর্দ্দুর কোনটাই বোঝে না, জানে

না। ঐ প্রত্যেকটি জাতির লাখ লাখ জনগণকে শিক্ষা, মানসিক বিকাশের এবং রাষ্ট্রের কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য তাদের প্রত্যেকের ভাষাকে রাষ্ট্রে সমান মর্যাদা দিতে হবে। প্রত্যেকটি জাতির বিকাশের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত হলো তার ভাষার অধিকার। যদি ঐ জাতিগুলির ভাষাসমূহকে বাংলা ও উর্দুর সমান অধিকার দেওয়া না হয়, যদি "অনগ্রসর" বলে তাদের ভাষার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তাহলে সে সব জাতি অজ্ঞ থেকে যাবে, রাষ্ট্রের দলিলপত্রাদি তাদের নিকট দুর্বোধ্য হয়ে থাকবে ও তার পরিণামে সমগ্র পাকিস্তানের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। এ জাতিগুলির ভাষা আজ অনগ্রসর বলেই আরও বিশেষ করে তাদের সুযোগ দিতে হবে যাতে ঐ লাখ লাখ জনতার বিকাশের পথ খুলে যায় ও তারাও রাষ্ট্রের কাজে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করতে পারে। পাকিস্তানের সমস্ত জাতির বিকাশের জন্য সমান সুযোগ দিতে হবে। এখানে বৈষম্যমূলক আচরণ হবে প্রতিক্রিয়াশীল। কাবণ পাকিস্তানেব সর্বাঙ্গীন উন্নতি নির্ভর করে ছোট-বড় সমস্ত জাতির সমান বিকাশের উপর।

দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের সমস্ত জাতি নিজ নিজ ভাষায় রাষ্ট্রকার্যে অংশ গ্রহণ ও শিক্ষালাভ করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, এ যুক্তিও প্রতিক্রিয়াশীল। **সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের সব দলিলপত্র ১৬টি ভাষায় প্রকাশিত হয়।** সেখানে কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রত্যেক প্রতিনিধি নিজ নিজ ভাষায় বক্তব্য বলেন। **তাতে ত কোন বিশৃঙ্খলা হয় নি।** বরং সেখানে দেখতে পাচ্ছি দুনিয়ার সেরা শৃঙ্খলা ও জাতিতে জাতিতে অভূতপূর্ব বন্ধুত্ব। পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির ভাষাকে সমান অধিকার দিলেও তেমনি শৃঙ্খলা, তেমনি জাতিগত বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। প্রত্যেক জাতিই যখন নিজ অধিকার পায় তখন কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না। প্রত্যেকের স্বার্থে প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে বন্ধুভাবে বাস করে।

আর, সমস্ত জাতির ভাষাসমূহকে স্বীকার করে নিয়েই সার্বজনীন ভাষা (Lingua Franca)-র সমস্যার সমাধান হতে পারে। সার্বজনীন ভাষা জোর করে চাপান যায় না। বিভিন্ন ভাষার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারায় যে ভাষা শিখতে, বলতে সহজ ও যে ভাষা সম্পদে পূর্ণ, সে ভাষাই পাকিস্তানের সার্বজনীন ভাষা-রূপে গড়ে উঠবে।

॥ ৮ ॥

পরিশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি যাতে সমানভাবে রাষ্ট্রের কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে, যাতে প্রত্যেক জাতি শিক্ষা ও কৃষ্টিতে বিকাশ লাভ করতে পারে তার জন্য সকল ভাষাকে সমান মর্যাদা দিতেই হবে। প্রত্যেকটি জাতির ভাষার অধিকার তার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্যতম মূল কথা।

আজ জনবিরোধী মুসলিম লীগ সরকার পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষীজাতির ভাষার অধিকারকে পদদলিত করে, তাদেরকে রাষ্ট্রের কাজে পূর্ণ অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, তাদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে চেপে রেখে পাকিস্তানে স্বৈরাচারী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা পত্তনের অঙ্গরূপে মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার ভাষা উর্দ্দুকে একমাত্র "রাষ্ট্রভাষা" করার যে প্রতিক্রিয়াশীল নীতি গ্রহণ করেছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী, পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান বেলুচি এটা মানবে না।

তদুপরি, সরকারের এ নীতির ফলে জেগে উঠবে জাতিগত কলহ। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীরা যখন দেখবে, তাদের ভাষার অধিকার অস্বীকার করে অন্য জাতির ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তখন স্বভাবতঃই তাঁরা সে ভাষার উপর ও সে ভাষাভাষী জনগণের উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান, বেলুচি ভাইদের

বেলাতেও ঠিক এটাই ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে ভাষার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে আজ বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী, পাঠান-পাঞ্জাবী প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বিরোধ জেগে উঠেছে। এতে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির একতা গঠনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

গণতন্ত্রকামীরাও যদি ভাষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীকে অস্বীকার করেন, শুধু বাংলা ও উর্দ্দুকে পাকিস্তানের "রাষ্ট্রভাষা" করতে চান তাহলে তাঁরাও মারাত্মক ভুল করবেন। অবশ্য, শুধু উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষা" করার সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বাংলা ও উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষা" করার দাবী এক ধাপ অগ্রগতি। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচি জনতা দেখবে যে, তাঁদের ভাষাকে চেপে রাখা হচ্ছে। তাই তাঁরা সে দাবী মানবে না। এ কথাও মনে রাখতে হবে, আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে যেমন ভালবাসি, তেমনি সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান ও বেলুচি ভাইরা তাঁদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকেও ভালবাসে। এবং ভাষার অধিকারের প্রশ্ন আজ সিন্ধী, পাঞ্জাবী, পাঠান ভাইদের মনেও জেগে উঠেছে ও সে জাগরণ বাড়বে। যদি আমরা এখনই তাঁদের দাবী স্বীকার না করি, তবে প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁদের সে জাগরণকে জাতিগত বিভেদের পথে চালিয়ে দেবে। এর পরিণাম সকলের পক্ষেই মারাত্মক হবে। লাভ হবে শুধু মুসলিম লীগ নেতৃত্বের।

তাই সে মারাত্মক পথে গণতন্ত্রকামীরা যেন না যায়। তাঁরা আজ পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিগুলির ভাষার অধিকার স্বীকার করুন এবং শুধু বাংলা ও উর্দ্দুকে "রাষ্ট্রভাষা" করার আওয়াজ ত্যাগ করে আওয়াজ তুলুন—সকল ভাষার সমান মর্যাদা চাই।

এ আওয়াজের ভিত্তিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির ভাষার সমান অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল জনতাকে

জাগিয়ে তোলা যাবে, তাদের ভিতর গড়ে উঠবে মহান সৌভ্রাতৃত্ব ও একতা এবং আমাদের ভাষার দাবী হবে অমোঘ। এ ভাবেই আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো ও ভাষার ক্ষেত্রে যুগ যুগের অত্যাচারকে খতম করতে পারবো।

একুশের কবিতা

আর যেন না দেখি কার্তিকের চাঁদ কিংবা
পৃথিবীর কোনো হীরার সকাল,
কোনোদিন আর যেন আমার চোখের কিনারে
আকাশের প্রতিভা, সন্ধ্যানদীর অভিজ্ঞান আর
রাত্রি রহস্যের গাঢ় ভাষা কেঁপে না ওঠে,
কেঁপে না ওঠে পৃথিবীর দীপ্তিমান দিগন্তের তারা।
আগুনতাঁতা সাঁড়াশি দিয়ে তোমরা উপড়ে ফেলো আমার দুটি
চোখ—
সেই দুটি চোখ, যাদের প্রাজ্ঞ দীপ্তির মৃত্যুহীন, বিদ্রোহী জ্বালায়
দেখেছি নির্মম আকাশের নিচে মানবিক মৃত্যুর তুহিন-স্তব্ধতা,
দেখেছি বাস্তুহারা কুমারীর চোখের বাষ্পকণার মতো কুয়াশা-ঢাকা
দিন,
দেখেছি মোহাম্মদ, যীশু আর বুদ্ধের বিদীর্ণ হৃদয়, তাঁদের রক্ত
ঝরে ঝরে পড়ছে সাদা সাদা অসংখ্য দাঁতের কুটিল হিংস্রতায়।

আর যেন না দেখি প্রিয়ার স্বপ্নজড়ানো নরম-সোনালি চুল,
কোনো শ্রাবণরাত্রির জানালায় রাখা তার মুখের গভীরতা,
আর যেন আমার চোখের কিনারে
কেঁপে না ওঠে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ঢেউ, আমার দেশের নীরক্ত
শরীর॥

তারপরো আমার আত্মার স্বর বীক্ষণের প্রতিভা ছড়াবে অমাবস্যা-
নিমগ্ন প্রাণের শিকড়ে শিকড়ে,

প্রমেথেউসের গানের মতো আমার গলার রৌদ্রোজ্জ্বল চীৎকার
কাঁপিয়ে দেবে এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস,
ফেটে চৌচির হয়ে যাবে মিশরীয় স্ফিংক্সের স্থবিরতা,
খসে যাবে তোমাদের রাত্রির দীপ্তিমান তারা, দিনের সূর্য ॥
টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো আমার সূর্যের মত হৃদপিণ্ড,
যেমন কোনো পেশওয়ারী ফলওয়ালা তার ধারালো ছুরির হিংস্রতায়
ফালি ফালি করে কেটে ফেলে তাজা, লাল টকটকে একটি আপেল।
কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন পড়ে না মাটিতে,
কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের মতো
বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান।
তোমরা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলো আমার হৃদপিণ্ড—
যে হৃদপিণ্ডে ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে আমার দেশের গাঢ় ভালোবাসা,
যে হৃদয়—

মা'র পবিত্র আশীর্বাদের মতো
বোনের স্নিগ্ধ, প্রশান্ত দৃষ্টির মতো,
প্রিয়ার হৃদয়ের শব্দহীন গানের মতো
শান্তির জ্যোৎস্না চেয়েছিল পৃথিবীর আকাশের নিচে,
চৈত্রের তীব্রতায়, শ্রাবণের পূর্ণিমায়।

দোহাই চেঙ্গিসের উলঙ্গ তরবারির হিংস্রতার,
দোহাই ফ্যারাওয়ের ম্যমিগন্ধি বীভৎসতার,
দোহাই তৈমুরের পৈশাচিক রক্ত-নেশার,
তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও
উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব
নিশ্চিহ্ন করে দাও, নিশ্চিহ্ন করে দাও ॥

শামসুর রাহমান

বাতাসের সোহাগে রাত এলো বুনো,
কারা জানি ছাত্রাবাসে মারা গেছে, 'শোনো
শোনো' তারপর গলি, ঘর, হ্যারিকেন আলো
মুহূর্তের মতো চুলে হাত বুলালো,
বই মেলে থেমে গিয়ে হৃদয়ের আওয়াজে,
আর্তিতে হাড়-ভরা ছায়া কাঁপে লাজে
চূণ ওঠা দেয়ালে,
মনে মনে বলে, 'বরকতের চোখে বুঝি ভবিষ্যৎ বুঁজে আছে'।

অমাবস্যাগাঢ় চোখের একান্ত নীলে
স্বদেশই মিছিল ;
স্বপ্নের ধ্বনিগুলি মানুষের ভুবাহুতে মিলে ;
সমুদ্রের ঢেউ আজো, আকাশের আবেগে আজো নিবিড় সুনীল।

'শোনো হাইকোর্ট-মোড়ে-হাঁ ওরা এগোল আবার'
তারা বলে—"কতো ছেলে কুলি কেরানী অবধি !"
খাতা বই চেপে ধরে চোখে ভাসে মরা খুলি
বরকতের সাহস বুঝি অণু দুরন্ত আক্রোশে ভুবাহুতে তুলি
খুনিকে খোঁজে
তারা বলে : 'বিদ্রোহী অশ্বারোহী সেনাদের মতো কি অসহ ধূলি'।

এখনো
এখনো যে বরকতের আর্তনাদ গুলীর আওয়াজে
অণু দুরন্ত আক্রোশে বারে বারে খুনীকে খোঁজে।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

কাল রাতে উঠেছিল ঝড়।
আম-জাম-নিমের শাখায়
কাল রাতে এসেছিল
সত্যকার ঝড়।

ফাল্গুনের রৌদ্রতপ্ত তৃষিত মাটিতে—
সে ঝড় কাঁপন তুলেছিল,
দিয়েছিল
কাজল মেঘের হাতছানি।
অবোধ গাছের যত পাগল পাতারা
ক্ষেপে উঠেছিল।
ভেবেছিল, এই ঝড়
আনবে আনবে এক অমৃত ক্ষরণ
আনবে আনবে এক অরুণ জীবন॥

আজ ভোরে উঠে দেখি
আকাশ গম্ভীর,
গাছের পাতারা সব
স্তব্ধ হয়ে আকাশের গায়
স্তব্ধ-চিত্র এঁকে দিয়ে মেলে মেলে আছে
বিদ্যুতের তারে তারে অখণ্ড নিরাশা॥
তবে বুঝি আসেনি-ক ঝড়
তবে বুঝি এসেছিল শুধুই ইঙ্গিত
কিংবা শুধু এসেছিল সঙ্কেতের মায়া॥

"না—না—না"
আমার ঘরের কোণে বিমর্ষ দাহুরী
সে কহে "এসেইছিল ঝড়।
দেখনা তোমার আঙিনায়
ভেঙেছে গাছের শাখা
পড়েছে অনেক কাঁচাপাতা ?
কাল শুধু অপমৃত্যু নিয়ে
এসেছিল ঝড়।
সে ঝড় আনেনি কোন প্রাণের বর্ষণ।"

বাতায়ন খুলে দেখি আমি,
আকাশের কোণে কোণে
এখনও লেগে আছে মেঘ।
আমার ত মনে হয়
এই মেঘে আসবে বর্ষণ
এই মেঘে বুনে যাবে
অসংখ্য জীবন ॥

আবদুল গণি হাজারী

শীতল পৃথিবী, অবশ নগর,
অসার আকাশ, বাতাস নিথর,
ফুটপাতে শুধু ছড়িয়ে আছে জীবনের সব রেণুকণা যত।
রোদগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে, বিছিয়ে রয়েছে ঘাসের মতন,
পলাশ ফুলের ডগায় ডগায়, ল্যাম্পপোষ্টের উঁচু কোণটায়।
একুশে বিকেল।
মৃত্যু হয়েছে আজকে ওদের।
বোবা পাখীগুলো পাখা ঝাপটায়।
একুশে রাতের আঁধার নামে সব শহরের গলিঘুঁজিতে,
গাঁয়ের বাঁকা পথগুলোতে,
রেল কলোনীতে, কেরানীর ঘরে, কিষাণের ঘরে।
ঘরে নয় শুধু। সবার বুকে
আঁধার নেমেছে।
আজকে তাদের মৃত্যু হয়েছে তাই শুনে সব স্তব্ধ পাষাণ।
সব চুপচাপ।
পাখীগুলো শুধু পাখা ঝাপ্‌টায়। ব্যথায় বোধ হয়।
সবাই শুধোয়। শিলাময়।
মন কথা কয়ে ওঠে :
ওদের কি আজ মৃত্যু হয়েছে ?
মৃত্যু হয়েছে ? মৃত্যু হয়েছে ?

হাসপাতালের গন্ধবাতাস।
বাইরে প্রহরী। খবর কোথায় ?

সবাই শুধোয় রাস্তার দল, অফিসের লোক,
দোকানী, পসারী, ও পাড়ার মুদী,
নৌকার মাঝি হাল ছেড়েছে,
কামারের ঘরে হাপর থেমেছে,
কাস্তে থেমেছে, কোদাল থেমেছে,
রেলইঞ্জিনে সিটি থেমে গেছে।
ঘুমভাঙা কোন কবরখানায় জলার ধারে
প্রহরী কুকুর ডেকে ডেকে কয়
: শহরে কি আজ মিছিল ছিল ?
ফাল্গুনী রাত আঁধারে কাঁদে। একা ল্যাম্পপোষ্ট মিটিমিটি জ্বলে

শহরে সেদিন মিছিল ছিল।
পৃথিবী সেদিন উল্টো ঘোরেনি, এগিয়ে গেছে।
সবাই শুন্‌লো : খুন হয়ে গেছে, খুন হয়ে গেল।
মায়ের চোখের দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছে রমনার পথে।
ধানের গুচ্ছে রক্ত জমেছে, সমুদ্র তাই উদ্বেল হল।
ইস্পাত-দৃঢ় কঠিন শপথ।
কাজ নয় আর কাজ নয়।
ফেরারী বসন্ত কয়ে দিয়ে গেল নগরীর যত
শিবিরে শিবিরে :
কাল শহরে মিছিল ছিল।
কাজ নয় আজ কাজ নয়।
সকালের রোদে খবর পেয়েছে
বাংলার ঘরে সব ভাইবোন
: হত্যা হয়েছে কাল শহরে।
তাই কাজ নয় আর কাজ নয়।
মৃত্যুকে যারা ভয় করেনি,

মৃত্যু তাদের বরণ করেছে,
এ খবর গিয়ে গাঁয়ে পৌঁছেছে
সবার মুখেই বজ্র শপথ
: হাতুড়ী আমরা নামিয়ে নিলাম
কাস্তে-কোদাল থামিয়ে দিলাম
কাঁচা-শহীদের স্মৃতির ভারে।
পাড়ার মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টটাও অবনমিত
শ্রদ্ধাভরে।
বাংলার কোন দূরেদেশ গাঁয়ে।
সজনে তলায় মাটির ঘরে উঁচু দাওয়াটায়
প্রদীপ জ্বলে
জীবনের সব ভীরু পাখাগুলো জড়ো হয়ে আছে মায়ের মনে।
একাকী মায়ের ফাঁকা বুকখানি কেঁপে কেঁপে ওঠে কিসের শোকে?
"মাগো, ভাবনা কিসের? আস্ছে ছুটিতে আবার
ফিরবো তোমার কোলেই।"

শহীদ ছেলের শেষ কথাগুলো মনে পড়ে যায় একলা রাতে।
দুঃখিনী মায়ের আঁচলের ধন ফিরে আসবেই
রাত্রিশেষে। ছুটির শেষে।
আকাশের যত তারারা আজ্কে ভীড় করে সব মিছিল করেছে।
সখিনা মায়ের অশ্রু ছুঁয়ে শপথ নিয়েছে।

আর চুপ নয়,
মায়েরা সব গেয়ে ওঠো আজ।
ধান ভান্তে ক্ষুদ্ কুড়োতে,
গমের শীষের খোসা ছাড়াতে

মায়েরা সব গেয়ে ওঠো—
আর চুপ নয়, এবার শুধু
শহীদের গান। বিজয়ের গান ॥
শহরে যাদের মৃত্যু হয়েছে,
ফিরে আস্‌ছে, ফিরে আস্‌ছে,
হাজারে হাজারে মিছিল করে ॥

ফজলে লোহানী

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো। যে-ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য
পারেনি ভাঙতে

হীরার মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধূলায় চূর্ণ যে-পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী
চারকোটি পরিবার॥

এ-কোন মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
শিয়রে যাহার ওঠেনা কান্না, ঝরেনা অশ্রু ?
হিমালয় থেকে সাগর অবধি সহসা বরং
সকল বেদনা হয়ে ওঠে এক পতাকার রং
এ-কোন মৃত্যু ? কেউ কি দেখেছে মৃত্যু এমন,
বিরহে যেখানে নেই হাহাকার ? কেবল সেতার
হয় প্রপাতের মহনীয় ধারা, অনেক কথার
পদাতিক ঋতু কলমেরে দেয় কবিতার কাল ?

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি আমরা
চারকোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।

পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহীদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্য্যের মতো জ্বলে শুধু এক
শপথের ভাস্কর॥

আলাউদ্দিন আল আজাদ

আকাশের আরশীতে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে
সলজ্জ প্রভাতকে দেখছিল
রাতজাগা সূর্য্য
শিশির স্নিগ্ধ কাঁচা ঘাসের নরম ডালে
ডাগর চোখ মেলে তাকালো
লক্ষ কোটি মুক্তোর মেয়ে।
চারশো চুল্লীর চিমনীতে
অভিমানী ধোঁওয়াটা উদার থেকে
উদারতর হোল। তারপর কখন
অজান্তে ছুঁয়ে চলে গেল
মেটো শালিকের হলুদ পেখম
আলোর ঝরণাকে সচকিতে
ঝাপসা কোরে দিয়ে।

সাদা কেম্বিসের টুকরো ফিতেটা
আনাড়ী বন্ধনে বেঁধে নিয়ে
স্কুলধাওয়া করা ছেলেটা
সাবানঘোলা চোখ নিয়ে
তাকালো সবচে' পুরোন বাড়ীর
সবচে' বনেদী ঘড়িটার দিকে। আর
পাংশুটে ঘণ্টার চীৎকারে পুকুরের
ঘাটে এসে ভীড় দেখে
ভীরু অফিসী কেরানীরা
আর নাবলোনা ঘাটের
সিঁড়ি বেয়ে।

আমলকীর বন সরিয়ে
অশথ গাছের ছায়া মাড়িয়ে
আস্তাকুঁড়ের ভিটে ছাড়িয়ে
মেয়েস্কুলের বাসটা কাঁকরের
বুকে হিমসিম খেয়ে
বড় সড়কে চললো।

তখুনি কে জানে কেন,
দুপুরের খর-উত্তাপ-সূর্য্যকে
শাসিয়ে দিয়ে লক্ষ কোটি চীৎকারের
বজ্র স্ফুলিঙ্গ বন্যার মত
অজস্র প্রতিজ্ঞা
ছড়িয়ে দিয়ে গেল
উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হাওয়ার পালকে

জনতার চীৎকারে কাজী দেউড়ির
ভীত সন্ত্রস্ত বউটা ভুলেই গেল
সাত পুরুষের আবরু বাঁচাতে।
কেন না, আগর বাতির গন্ধমাতাল
ছোট চিল কোঠা থেকে শেষ নামাজের
রুকু ভেঙ্গে দিয়ে বিদ্রোহী চুলের
ফিতে খুলে দিয়ে সে দেখছিল
কেমন কোরে বিজলী তারের
ছুটো তারে তারে
স্ফুলিঙ্গের আলিঙ্গন
দিয়ে আত্মহত্যা কোরছিল
ঘুম ঘুম দুপুরের বোকা কাকটা

নাম জানা না জানা
নামতার মত আনাগোনা
মানুষের।
দেখতে দেখতে ছেয়ে গেল খালি মাঠটা।
পুকুর পারের ঘাটটা
পীচঢালা রাস্তার আবলুশ বুকটা।

তখুনি ঠিক তখুনি কোন এক স্কুল ফেরতা
হাবা ছেলের কথাটা না ফুরোতেই
কাল মেয়ের লাল টকটকে ফিতের
গেরোটা বাঁধা না হোতেই
দুপুরের রোদের দাহকে কটাক্ষ
কোরে আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গ
লিখে গেল তার যাত্রীর নাম।
ঋণ হয়ে গেল রক্তের দাম।

রুদ্র সূর্য্য তাকালো আবার—
দেখলো আকাশের আরশীতে সলজ্জ
প্রভাত কে নয়,
রক্তাক্ত মাটির চাঁদোয়ায়
জ্বলন্ত দুপুরকে।

আনিস চৌধুরী

"কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা,
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা,
আর, আমি ডালের বড়ি
শুকিয়ে রেখেছি,—
খোকা তুই কবে আসবি !
কবে ছুটি ?"

চিঠিটা তার পকেটে ছিল,
ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা।

"মাগো, ওরা বলে,
সবার কথা কেড়ে নেবে
তোমার কোলে শুয়ে
গল্প শুনতে দেবে না।
বলো, মা তাই কি হয় ?
তাইতো আমার দেরী হচ্ছে।
তোমার জন্যে কথার ঝুড়ি নিয়ে
তবেই না বাড়ী ফিরবো।
লক্ষ্মী মা রাগ ক'রোনা,
মাত্রতো আর কটা দিন।"

"পাগল ছেলে"
মা পড়ে আর হাসে,
"তোর ওপরে রাগ করতে পারি!'
নারকেলের চিঁড়ে কোটে,
উড়কি ধানের মুড়কি ভাজে
এটা সেটা আরো কত কি!
তার খোকা যে বাড়ী ফিরবে!
ক্লান্ত খোকা!

কুম্‌ড়ো ফুল
শুকিয়ে গেছে,
ঝ'রে প'ড়েছে ডাঁটা;
পুঁইলতাটা নেতানো,—
"খোকা এলি?"—
ঝাপসা চোখে মা তাকায়
উঠোনে, উঠোনে
যেখানে খোকার শব
শকুনিরা ব্যবচ্ছেদ করে।

এখন,
মা'র চোখে চৈত্রের রোদ
পুড়িয়ে দেয় শকুনিদের।
তারপর,
দাওয়ায় ব'সে
মা আবার ধান ভানে,
বিন্নি ধানের খই ভাজে,

খোকা তার
কখন আসে! কখন আসে!
এখন,
মার চোখে শিশির ভোর,
স্নেহের রোদে
ভিটে ভরেছে।

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

তখন আকাশের উঁচু আলিসায়
ঝড়ে ভেজা এক কাকের মতন
প্রহর ঝিমোয়।

সেদিনের কথা ভুলি নি, কি করে ভুলি ঃ
রোদে তেতে ওঠা রমনার পথে ঘুর্ণি হাওয়া ;
বটের শীতল ছায়ায় ছায়ায় দম্‌কা হাওয়া,
রক্ত মিছিল।

বুলেটের মুখে কচি তাজা প্রাণ বিলীন হলো।
বেলুনের মতো ফুসফুসগুলো চুপসে গেলো।
কৃষ্ণচূড়ার কচি কচি ডাল ভেঙ্গে খান খান,
ঝুর ঝুর লাল পলাশ ঝরে,
অশত্থ পাতা উর্দ্ধমুখী ব্যথায় কাঁপে।

একথা যখন ছড়িয়ে পড়লো দম্‌কা বাতাসে
শহরে শহরে,
প্রতি বন্দরে,
ক্ষেতে ও খামারে
উল্কার মত ছড়িয়ে পড়লো
ফাটা বাংলার নিভৃত কোণে ঃ
শোন আজ শোন,
কে আছ তোমরা
রমনার পথ পিছল হলো।

কি এক ব্যথায় মূক হয়ে গেলো
লোকগুলো সব।
তারপর সেই জলভরা চোখ
দুই হাতে মুছে
চকমকি-ঠোকা আগুন জেলে
আকাশ ফাটানো হাঁক দিয়ে গেলো :
শোধ চাই, এর শোধ চাই।

শ্রাবণ আকাশে কত জল আছে
তার বেশী জল মায়ের চোখে।
চৈতী হাওয়ায় কত কথা জমা
তার বেশী কথা মায়ের বুকে।
মায়ের বুকের রুদ্ধ সে কথায়
প্রাণ দাও, আজ প্রাণ দাও।
ঝড়ের ডানায় ঝাপ্টা মেরে
দুলতে থাকুক মুক্ত কথারা।
নির্ভয়ে তারা আশ্বাস দিক
তোমার, আমার সবার মনে।

জামালুদ্দিন

আমার তিমির রাত্রি অকস্মাৎ সূর্যবিদ্ধ হলো,
অলস মনের গাঙে বন্যা এলো কর্ম ব্যস্ততার,
নয়নের নভ হ'তে তন্দ্রার মেঘেরা পালালো,
বক্ষ হ'তে নেমে গেল শতাব্দীর দ্বিধার পাহাড়।
নিস্তব্ধ জগতে আজ পড়ে গেছে কাফেলার সাড়া,
সংশয় কুয়াশা মিথ্যা—মিথ্যা তাই ব্যর্থতার তাপ
আমার আকাশে আজ নবসৃষ্টি—ঝড়ের ইশারা,
মিথ্যা মনে হয় তাই—কারো তরে প্রতীক্ষা বিলাপ

মিথ্যা মনে হয় তাই নভাঙ্গণে চেয়ে তারা গোণা,
জীবনের রাজপথে ছুটে চলি গতি অবিরাম,
মুক্তির-সমুদ্রগামী দ্বিধাহীন আমার বাসনা—
বাধার পাথর ভেঙ্গে ছুটে চলে স্বাধীন উদ্দাম।
এখানে জুলুম রোখে জনতার দুর্বার পরিখা,
লক্ষ লক্ষ জঙ্গীমন গুচ্ছবদ্ধ এক অভিলাষে,
মৃত্যুর নির্মম-ছায়া রচে নাকো ভীতি বিভীষিকা,
আজিকে আমার নভে জাগৃতির শুকতারা হাসে।

আতাউর রহমান

সভ্যতার মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
শিশুর জন্ম থেকে জরাদেহ ক্ষীণশ্বাস মানবের অবলুপ্তির
সীমারেখায়
বলে গেল সেই কথা। সেই কথা বলে গেল অনর্গল—

তপ্তশ্বাস হাহুতাশ পাতাঝরা বিদীর্ণ বৈশাখীর জ্বালাকর দিনের
দিগন্তে
আষাঢ়ের পুঞ্জীভূত কালো মেঘ আসবেই ঠিক।
সাগরের লোনাজলে স্নিগ্ধ মাটির দ্বীপ
শ্যামলী স্বপ্নের গান বুকে পুষে
নবীন সূর্য্যেরে তার দৃঢ় অঙ্গীকার জানাবেই।
সংখ্যাহীন প্রতিবাদ ঢেউয়েরা আসুক, তুমি স্থির থেকো।
প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝাবাত অবহেলা করি
সঞ্চয় করে যাও মুঠো মুঠো গৈরিক মাটি ঃ
সবুজ গন্ধবাহী সোনালী সূর্য্যের দিশা
অকস্মাৎ উদ্ভাসিত কে :র দেবে তোমার চলার পথ।

সভ্যতার মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
শিশুর জন্ম থেকে জরাদেহ ক্ষীণশ্বাস মানবের অবলুপ্তির
সীমারেখায়
বলে গেল সেই কথা। সেই কথা বলে গেল অনর্গল
পৃথিবীর জিজীবিষু আত্মার কাছে। ঘনীভূত জনতার হৃদয়ে
হৃদয়ে
উজ্জ্বল শিখা সেই অমর সংবাদ ঢেউ তুলে দিয়ে গেল॥

সৈয়দ শামসুল হক

এ সব রাত্রিকে ঢেকে দাও
সমুদ্রের বিশাল গহ্বরে ; নয়ত উধাও
মেঘ ভরে আনো অবিশ্রাম
বর্ষার সঙ্গীত ॥

এক ঝাঁক নাম
মুখরিত সূর্যে কাঁপে
সুদূর বিস্তৃত সেই একক সংলাপে ॥

ইতিহাস তারা নয়
বিস্মৃতি বিলয়
তাদের প্রচ্ছন্ন করে রাখে না কখনো ॥

সমুদ্রের গান শোনো—
সে গানে তাদের হাসি
কী আশ্চর্য ফুল হয়ে ঝরে।
তোমরা যে কথা বলো—সেই স্বরে
তাদের প্রতিজ্ঞা মিশে আছে।
তোমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে
তোমাদের পদক্ষেপে—প্রত্যেক বিশ্বাসে
তোমাদের স্নেহে প্রেমে আষাঢ়ে-আশ্বিনে
ভাই-বোন-মায়েদের স্মরণীয় দিনে
অবিচ্ছিন্ন তাদের হৃদয়।

তারা তো তোমার কথা
তারা তো আমার কথা—
তোমাদের আমাদের সকলের হাসি
চেয়েছিলো। এ দেশে প্রবাসী
নয়—তারা হতে চেয়েছিল
এ দেশেরি ঘাসের শিশির।

তারা ভালোবেসেছিলো গোধূলির
রক্তিম আকাশ, সুদূর বিস্তৃত মাঠ
ফুল পাখী প্রজাপতি হাওয়া ও ভরাট
শস্যের এ ক্ষেত, কিষাণের ভাটীয়ালী
মাঝিদের নির্ভীক সংঘাত—
তারা ভালোবেসেছিলো
জীবনের প্রসন্ন প্রপাত।

দৈনিক দারিদ্র্য ঠেলে আমরা যে গানে
হেসে উঠি,—মেয়েরা ঢেকিতে ধান ভানে,
মায়ের যে গানে ফোটে দোলনার কচি মুখে হাসি
যে সুরে কবিতা লিখি—
প্রেয়সী নারীকে ভালোবাসি
তারা ভালোবেসেছিলো সে গানের
জন্মে জন্মে পরিচিত ভাষা।

বিষণ্ন পিপাসা
নিয়ে তাই তারা ছড়িয়েছে
কি দুরন্ত কৃষ্ণচূড়া মেঘ

ঝড়ের আবেগ

তারা—জুড়ে আছে এদেশের সমস্ত হৃদয়।
তাই তারা বিস্মৃতির ইতিহাস নয়॥
ক্লান্তির রাত্রিকে ঢাকো এ সূর্যের
প্রমত্ত আস্বাদে। সমুদ্রের
বিশাল গহ্বরে আনো
প্রজ্ঞার তরঙ্গ অবিশ্রাম
কৃষ্ণচূড়া মেঘে হোক মুখরিত
এক ঝাঁক নাম॥

মোহম্মদ মনিরুজ্জামান

দেশের মানুষ একটি দণ্ডে
একাত্ম হয়েছিল,
স্নায়ু গ্রন্থিতে পাঁজরে-পেশীতে,
মেখে নিয়েছিল একটি অঙ্গীকার—
সেদিন প্রথম।
এবং প্রথম নতুন দিগ্বলয়ে
সঞ্চারমান এ দেশের ইতিবৃত্ত।

চেতনার পথে দ্বিধাহীন অভিযাত্রা
নানান্-মুখীন হাজার লোকের
একত্র অস্তিত্ব
একুশে ফেব্রুয়ারী।

অতন্দ্র রাতে বিবেক-বিদ্ধ স্বার্থপরায়ণের
পাতা-ঝরার শব্দে চকিত
দুর্ভাবনার লেখা
একুশে ফেব্রুয়ারী।

কালো পতাকায়
প্রাচীর-পত্রে
অশ্রু-তরল রক্তরঙের লিপি
ক্রোধের
ঘৃণার
ভয়াল বিস্ফোরণ
একুশে ফেব্রুয়ারী।

তারপর সেই কালো বাদুড়ের পাখ্না আড়াল
হালকা আঁধারে ঢাকা
দৈত্যের আনাগোনা ;
(যার নাম দুরদৃষ্ট !)
ভেল্‌কী-হাতের অদৃশ্য কৌশলে
বছরে বছরে রূপান্তরিত-মূল্য
একুশে ফেব্রুয়ারী ।

একটি মহৎ জন-জাগৃতি
একটি সবল জীবন-চেতনা
সংকল্পের শবদেহে পরিণত ।

একুশে ফেব্রুয়ারী
অতীতের কোনো নির্বাক একদার
দেশের লোকের গর্ব-গৌরবের
অশ্রু এবং রক্তদানের
ক্ষয়ে ঝরে যাওয়া প্রেরণা-মূল্য
নিখিল জীর্ণ নিষ্প্রভ ইতিহাস ।

সিকান্‌দার আবু জাফর

আকাশে একঝাঁক শ্বেত-কপোত ডানা মেলেছিল
ওরা আর ফিরে আসেনি ;
সমস্ত আকাশটা রক্তের রঙে লাল—
ওরা আর ফিরে আস্‌বে না।

শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ক'জন আমরা
নির্বাক প্রস্তরফলকের মত নিষ্পন্দ হয়ে আছি,
আকাশের বেদনার ছায়া প'ড়ে প্রত্যেকের মুখ নীলাক্ত ;
আমরা সামনের দিকে মাথা নুইয়ে দিলাম।
মায়েরা তখন তাঁদের বুকভরা স্নেহ রাখলো স্মৃতি ফলকের ওপর,
বোনেরা সজল চোখে তাঁদের প্রীতি ফুল ক'রে ছড়িয়ে দিলো,
আর আমরা, আমাদের দু'হাত তুলে—
প্রার্থনায় হাত বাড়িয়ে দিলাম করুণাময়ের দিকে।

সাদা কাফনে সেদিন ওরা যেখানে বিদায় নিয়েছিলো,
কালো কাফন প'রে আমরা তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছি,
মাঝখানে শহীদ মিনারের পার্থক্য।
আমাদের সকলের মনে ঈশ্বরের কণ্ঠ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে
ধমনীতে বেজে উঠছে মাতৃভূমির পবিত্র সঙ্গীত ;
অথচ ওরা মুখে যে ভাষা দিয়েছিলো
আর্দ্র বিষণ্নতায় তা এখন স্তব্ধ।

মুহূর্তে আমরা নিজেদের ভাবময়তা সামলে নিলাম ;
আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে
বায়ান্নো সনের সূর্য তখন প্রস্তরফলকে প্রতিফলিত,
আর ওদের নামগুলো কি আশ্চর্য উজ্জ্বল !

আকাশে এক ঝাঁক শ্বেত-কপোত ডানা মেলেছিল
ওরা আর ফিরে আসেনি ;
সমস্ত আকাশটা রক্তের রঙে লাল—
ওরা আর ফিরে আসবে না।

মাহবুব তালুকদার

অসহ্য সময় কাটে, পায়ে পায়ে উড়ে যায় ধূলো
ক্লান্ত পাখীর মতো ক্লিষ্ট হয় আমাদের মন :
জীবিকার নীলছায়া মাখা দুই চোখের কোটর
হয় ভস্মাধার, আর
নির্জন পিপাসার পরিণাম পাক খেয়ে ওঠে,
দুপুরের উপশিরা ছিন্ন করে অতিষ্ঠ বাংলার।

আমিও অন্তরঙ্গ হয়ে যাই হঠাৎ তখন
জনতার সমুদ্রের সাথে
বাঘের হাতের মত সনখ শপথ
সোহাগের গাঢ় ইচ্ছা নিয়ে
নেমে আসে মনের ওপর !

নির্মম আদর পেয়ে আমিও রক্তাক্ত হবো
বরকতের শরীরের মত ?

আলমাহমুদ

আম্মা তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর ?
ঘূর্ণি ঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
ঘুরে ঘুরে জাগবে, ডাকবে,
দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না ?
কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি, কতোদিন ?
আবুল বরকত নেই ; সেই অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা
বিশাল শরীর বালক, মধুর ষ্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে তাঁকে
ডেকো না ;
আর একবারও ডাকলে ঘৃণায় তুমি কুঁচকে উঠবে—
সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার—কি বিষণ্ণ থোকা থোকা নাম ;
এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন
হৃদয়কে হানে ;

বিচ্ছেদের জন্যে তৈরী হওয়ার আগেই আমরা
ওদেরকে হারিয়েছি—
কেননা, প্রতিক্রিয়ার গ্রাস জীবন ও মনুষ্যত্বকে সমীহ করে না ;
ভেবে ওঠার আগেই আমরা ওদেরকে হারিয়েছি
কেননা প্রতিক্রিয়ার কৌশল এক মৃত্যু দিয়ে হাজার
মৃত্যুকে ডেকে আনে।
আর এবার আমরা হারিয়েছি এমন কয়জনকে
যাঁরা কোনদিন মন থেকে মুছবে না,
কোনদিন কাকেও শান্ত হতে দেবে না ;

যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল
দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কণা কণা করে ছড়িয়ে
দিয়ে গেল
দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে
যেতে যেতে।

আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কি আশ্চর্য, কি বিষণ্ন নাম! একসার জ্বলন্ত নাম॥

॥ ২ ॥

কৃষাণ যেমন বর্ষার পলিসিক্ত মাঠে রোয়া ধানের চারাগুলো
রেখে আসে সোনালী শস্যের জন্মের আকাঙ্ক্ষায়
তেমনি আমার সরু সরু অনুভূতিগুলো জনতার গভীরে
বুনে এসেছি,
দেশ আমার, ইতিহাসের ধারা যে জ্ঞান আমাকে দিয়েছে তারই
পবিত্র সন্তান একটি দিনে তোমার হৃদয়ের বিদীর্ণ আভাকে
দেখিয়েছ—বিদীর্ণ আভায় জ্বলেছিল ;
যে আভারই আকস্মিক স্পর্শে হয়তো
কহিতুর চূর্ণ চূর্ণ হয়ে ছড়িয়েছিল প্রাণপ্রার্থী প্রান্তরে প্রান্তরে।
দেশ আমার তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে
এবার এলাম

তোমার প্রাণের গভীর জলে স্নান করে এবার এলাম ;
শ্রমিক তার শিল্পে প্রতিভার স্বাদ মেশাতে পেরে
যে তৃপ্তিতে বিশাল হয়ে ওঠে তারই স্পর্শের পরাগ
সারা চেতনায় মেখে একবার আকাশের দিকে তাকালাম,
একবার তোমার গ্রাম যমুনার ঘোলা স্রোতে দৃষ্টিকে
ডুবিয়ে নিয়ে

লক্ষ লক্ষ চারা ধানের মতো আদিগন্ত প্রাণের সবুজ
শিখাগুলো দেখি,
কি আশ্চর্য প্রাণ ছড়িয়েছ— একটি দিন আগেও তো বুঝতে
পারি নি,
কি আশ্চর্য দীপ্তিতে তোমার কোটি সন্তানের প্রবাহে প্রবাহে
সংক্রমিত হয়েছ—
একটি দিন আগেও তো বুঝতে পারি নি, দেশ আমার ॥
জন্মদাতা পিতার বাষ্পস্তব্ধ চোখ দুটোকে একবার মনে করো,
একটি মাত্র ভাইকে হারিয়ে বোনের অকস্মাৎ আর্ত চিৎকারকে,
সময়ের নিভৃত মন্দিরে সংগোপনে এসে যারা পরস্পরে
হৃদয়ের সততার কথা বলে গেছে
তাদের একজন আজ নেই
যুগল পাখির একটি আজ নেই

করুণ আঁখি হরিণী তার কোমল শাবকটিকে হারিয়েছে ;
সমুদ্রের আকুল ঢেউয়ের মতো সীমাক্রান্ত কান্না,
দিকে দিকে প্লাবিত কান্না, দৃষ্টিমান তার চক্ষুকে হারিয়েছে ;

হে আমার জ্ঞান একটি মাত্র উচ্চারণের বিষ আমাকে দাও
যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে ছড়ায়,
ওষধি জন্মের মতো একবার স্পন্দিত হয়ে যে ঘৃণা আর
কখনো মৃত্যুকে জানে না, হে আমার জ্ঞান !

আয়ুর প্রথম হৃদয়মন্থিত শব্দ,
মনুষ্যত্বের প্রথম দীক্ষা যে উচ্চারণে
তারই সম্মানের জন্যে তাঁরা যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ;
বুদ্ধ আর মোহাম্মদের দৃষ্টির মতো দীপ্তি
ফল্গুর মুখদেশের মতো উন্মথিত আবেগ,

আকাশের যে সাতটি তারা সমস্ত নীলিমার ভেতর
চিহ্নিত হয়ে আছে
তাদের মতো অনন্য—
জীবনের শত্রু শয়তানেরা সেই পবিত্র দেহগুলো
ছিনিয়ে নিয়ে গেছে—
আর তাঁদের আত্মা এখন আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে পোষণ করি ॥

তাঁদের একজন আজ নেই—
না, তারা পঞ্চাশ জন আজ নেই—
আর আমরা সেই অমর শহীদদের জন্যে,
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে একচাপ পাথরের
মতো এক হয়ে গেছি,
·
হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি ॥
হে আমার দেশ, বন্যার মতো
সমস্ত অভিজ্ঞতার পলিমাটিকে গড়িয়ে এনে একটি
চেতনাকে উর্বর করেছি ;
এখানে আমাদের মৃত্যু ও জীবনের সন্ধি,
সমুদ্র সৈকতে দুঃসাহসী নাবিকের করোটির ভেতর যেমন
দূরদিগন্তের হাওয়া হাহাকার করে
তেমনি এখানে রয়েছে একটি কোমল নারীর আশাহত সখিনা
হৃদয়,
এখানে রয়েছে মা আর পিতা,
ভাই আর বোন, স্বজনবিধুর পরিজন
আর তুমি আমি, দেশ আমার।
এখানে আমরা ফ্যারাউনের আয়ুর শেশ কটি বছরের ঔদ্ধত্যের
মুখোমুখি,

এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,
দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে-এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষে থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি :
এবার আমরা তোমার ॥

॥ ৩ ॥

বস্তীবাসিনী মা অকস্মাৎ স্বাস্থ্যবান একটি সন্তানকে বুকের
কাছে ধরতে পারলে
যেমন করে আহত দিনের অসংখ্য মৃত্যুকে ভুলে থাকতে পারে
তেমনি পঞ্চাশটি শহীদ ভাইয়ের মৃত্যুকে ভুলেছি
মা, তোমাকে পেয়েছি বলে।
আজ তো জানতে একটুকু বাকী নেই মাগো,
তুমি কি চাও, তুমি কি চাও, তুমি কি চাও।

হাসান হাফিজুর রহমান

একুশের-প্রবন্ধ

আমাদের ভাষা সমস্যা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
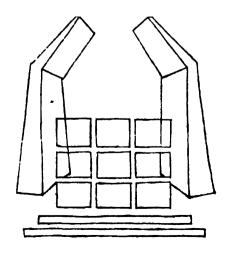
যেমন রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Democracy) আছে, ভাষার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি। যে সময় ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময় সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাততন্ত্রের ভাষা। লৌকিক ছিল গণতন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন, "লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য। ন ম্লেচ্ছিতবৈ। নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ঋষিরা বলিলেন, খবরদার! ব্যঞ্জনের উচ্চারণে কিংবা স্বরের উচ্চারণে যদি এক চুল পরিমাণ এদিক-ওদিক হয়, তবে আর তোমার রক্ষা নাই। দেখ না অসুরেরা 'হে অবয়ঃ হে অবয়ঃ' স্থানে 'হেলয়ঃ হে .য়ঃ' বলিয়াছিল, তাই তাহারা ধ্বংস হইয়া গেল। দেখ না বৃত্রের পিতা পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ইন্দ্রশত্রু শব্দ বলিতে স্বরে অপরাধ করিয়াছিল। তাই বৃত্র ইন্দ্রের জেতা না হইয়া ইন্দ্রই বৃত্রের নিহন্তা হইল।" ঋষিদিকের শত সহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পূজা-অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধাবণে লৌকিক ভাষায় পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন, "ন ম্লেচ্ছ ভাষাং শিক্ষেত— ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না।" তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্দশা, বৌদ্ধ ধর্ম

তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাততন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্মের দোহাই দিয়া পালিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ লইল জৈন ধর্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

আর এক যুগ আসিল। এ-যুগ অন্ধকারময়। এ-যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাঠি প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের মূল।

তাবপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়াঘষিয়া সাধুভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষা ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিত তাহার অন্ধ সংস্কৃতভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা—ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল,—সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধুভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিলটন, জনসন প্রভৃতির ল্যাটিন বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়া রহিয়াছে এখনকার সাধুভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে। পরিণামে চরম পন্থারই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগের (Transitional Period)-এর উপযুক্ত

ভাষা বটে। একেবারে নি হইতে সা-তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।*

* ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে প্রদত্ত অভিভাষণের অংশ বিশেষ।

বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের এই মাতৃভাষা নিয়ে আমরা গর্বিত, কেননা এই ভাষায় রয়েছে এক অতি গৌরবময় ঐতিহ্য।

আজ থেকে এক হাজার বছর আগে এই ভাষার উদ্ভব এই দেশে—এই পাকিস্তানের মাটিতে, সংস্কৃত ভাষা থেকে নয়, 'প্রাকৃত'জন-সাধারণের কথিত 'প্রাকৃত' ভাষা থেকে। সংস্কৃতজ্ঞ অভিজাত শ্রেণীর চোখে যারা ছিল নীচ শ্রেণীর 'সাধারণ লোক', তাদেরই ওরা নাম দিয়েছিলেন 'প্রাকৃতজন'। তাদের ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য তাঁরা বিধান দিয়েছিলেন 'বৌরব' নামক কঠিন নরকের। বলা দরকার যে, প্রাকৃত ভাষা কালক্রমে আরও 'প্রাকৃত' হয়ে গিয়েছিল সাধারণ লোকের মুখে মুখে বিবর্তন লাভ করে। তার সেই পরবর্তী রূপের বেশ মানানসই এক নাম 'অপভ্রংশ'।

এই অপভ্রংশের পূর্বী অর্থাৎ মাগধী রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম (যদিও জন্ম কথাটি ভাষাব বেলায় ঠিক প্রযোজ্য নয়, কারণ ভাষার গতি নদী প্রবাহের মতোই নিরবচ্ছিন্ন) মোটামুটি ১,০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। আর তখন থেকেই বাংলা ভাষার সাহিত্য শুরু। বাংলায় রচিত হাজার বছরের পুরানো সাহিত্য পাওয়া গিয়েছে; এত প্রাচীন সাহিত্য পাক-ভারত উপমহাদেশের আর কোন ভাষাতেই পাওয়া যায়নি, আর পৃথিবীর অতি কম ভাষাতেই এত প্রাচীনকালে সুস্পষ্ট সাহিত্য প্রচেষ্টার নিদর্শন আছে। হাজার বছরের পুরানো বাংলা গীতিকা যা পাওয়া গিয়েছে, নেপাল রাজ-দরবারের পুঁথিমালা থেকে তার নাম বৌদ্ধগান ও দোহা বা চর্যাগীতি।

এতে রয়েছে বৌদ্ধ নাথপন্থী সহজ সাধক আচার্যদের সাধন সঙ্কেত। এক অপরূপ আলো-আঁধারী সন্ধ্যা বা হেয়ালী ভাষায় রচিত এই সাধনতন্ত্র পরবর্তী সুফী এবং বৈষ্ণব ভাবাদর্শের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ডাঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে এই গীতিকাগুলিই "যেমন একদিকে গজলের (ফারসী), তেমনি অন্য দিকে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল উৎস," (বাংলা সাহিত্যের কথা : ৭৬ পৃঃ)। কাজেই বিশ্বের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই প্রাচীন বাংলা গীতিকাগুলির মূল্য অপরিসীম।

তারপর থেকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি চলে এসেছে নানা ধারায়, বিচিত্ররূপে। তার মধ্যে প্রধান ধারাটি হচ্ছে গীতি-কবিতা। মূলতঃ এই গীতি-কবিতার জন্যই বাংলা সাহিত্য বিশ্ববিশ্রুত। বাংলা সাহিত্যের এই গৌরবের তাজমহল একদিনে রচিত হয়নি, বহু শতাব্দী ধরে অসংখ্য কবির গীতাঞ্জলি নিবেদনে বাংলা গীতি-কবিতার এই ঐশ্বর্যশালিনী ধারাটি পুষ্ট হয়ে উঠেছে। মানুষের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি প্রেম, মানব জীবনের বা মনুষ্যত্বের বড় পরিচয় প্রেমে। প্রেমের নানারূপ, তার সূক্ষ্ম অবস্থা বাংলা গীতি কবির নিপুণ তুলিকায় যে-ভাবে রূপায়িত হয়েছে, সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। বাঙালী ভাবুক কবির হৃদয় থেকে বিচিত্র লহরীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রেমের মন্দাকিনী ধারা। যেমন তার হৃদয়াবেগের গভীর-তার অন্তহীন করুণ মূর্ছনা, তেমনি তার বর্ণ-সুষমার চমৎকারিত্ব। আর সত্যি যা গভীর, সীমাহীন, তাই করুণ, এক ম্লান বিষণ্ণতার ছায়ায় ঢাকা। বাংলা গীতি-কবিতায় তাই এই বিষাদের ছায়া, বাঙালী কবির বীণা বেদনাময় বেহাগের সুরে বাধা, হৃদয়াবেগের কথা বলতে গিয়ে তার অন্তরের সীমাহীন অশ্রুরাশি অপার সমুদ্রের মত কেবলই উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

এত কথা, এত গান, এত কান্না গীতি-কবিতার মত আর আমরা কোথায় পাব। এর অলৌকিক সুরে সুরে আমাদের হৃদয়ের ভাব

যেভাবে মুক্তি পেয়েছে, মানুষ এমন উজাড় করে মনের কথা আর কিছুতেই বলতে পারেনি। বাংলা বাউল, ভাটিয়ালী, মুর্শিদী, মারফতী, কীর্তন, প্রসাদী—কোন্ গানের কথা বলব। বাংলা সব গানের সুরই তো প্রাণ-পাগল-করা। এই সুর যেন কেবলি ছাড়িয়ে যায়, হারিয়ে যেতে চায় কোন সীমাহীন উর্ধ্বলোকে, "হেথা নয় হেথা নয়"—লোক লোকান্তরের অভিমুখে বাংলা গানের অন্তহীন অভিসার।

আজকের বাংলা সাহিত্য শুধু গীতি কবিতার জন্য নয়, তার অন্যান্য বিভাগের সমৃদ্ধির জন্যও বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। তার লোকগাথা বিশ্বের সংস্কৃতি সেবীদের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে, আধুনিক বাংলা গল্প, উপন্যাস বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলেছে। আর কবিতার কথা তো বলাই বাহুল্য, এক রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে বাংলা কাব্য পৃথিবীকে যা দিয়েছে, পৃথিবীর লোক বহুদিন তার ঋণ শোধ করতে পারবে না।

এই বিরাট সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যের কোন বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তানের এবং বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের দান অল্প নয়। দৌলত কাজী থেকে নজরুল-জসীম উদ্দিন পর্যন্ত প্রতিভাবান বাঙালী মুসলমান কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছে অনেক। তাঁদের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের সোনার ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে আছে। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের আদি অনুপ্রেরণা মুসলমান পৃষ্ঠপোষকগণের কাছে এবং বাংলা সাহিত্যে মানবীয় সাহিত্যের পত্তন মুসলমান কবিদের হাতে—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দু'টি কথা চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

আর যে ভাষায় এই সাহিত্য রচিত, ভাষা হিসাবে তার গৌরবই কি কম? বাস্তবিক, বাংলা ভাষার মতো এমন একটি বৈজ্ঞানিক, সুপরিকল্পিত এবং সুশৃংখল ভাষা তাবৎ সভ্য জাতির ভাষাসমূহের মধ্যে দুর্লভ, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের এই অভিমত। ভাষার নিয়ম-

শৃংখলা আমাদের ভাষার মতো এমনটি ইউরোপীয়, আফ্রিকান বা আরবীয় ভাষায় নেই।

প্রথমতঃ দেখুন, বাংলা স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের ধ্বনিগুলি সুনির্দিষ্ট; সাধারণ ব্যবহারে কোথাও তাদের উচ্চারণের নড়চড় হয় না। ইউরোপীয় বর্ণমালার মতো বিভিন্ন শব্দে তাদের বিভিন্ন রকম উচ্চারণ হয় না। কাজেই ওরকম বারবার করে বাংলা শব্দের উচ্চারণ শিখতে হয় না। যে একবার অক্ষরগুলি চিনেছে, সে বানান করে সব শব্দই মোটামুটি শুদ্ধ করে পড়তে পারে। আরবী বা ইংরেজী ভাষায় তা পারা যায় না। তারপর বাংলা হরফ শব্দের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম চেহারা নেয় না, যেমন আরবী বর্ণমালার বেলায় হয়ে থাকে। এই কারণেই আরবীর চাইতে বাংলা পঠন ও ছাপা সোজা। অবশ্য বাংলা স্বরবর্ণগুলি অনেক ক্ষেত্রে লিখনে (ব্যঞ্জন ধ্বনির অব্যবহিত পরে হলে) স্বর চিহ্নের আকার ধারণ করে। কিন্তু ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বরধ্বনির এই রূপান্তর অযথার্থ নয়। আরবী হরকত তার তুলনায় অনেক বেশী অস্পষ্ট ও জটিল, আর প্রায়শঃ সেগুলি থাকে লুপ্ত এবং ব্যাকরণ ভাল না জানা থাকলে এই অদৃশ্য হরকতের রহস্য ভেদ করে আরবী বা উর্দ্দু পড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ভাষাতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় গুণ, বাংলা বর্ণমালা, বৈজ্ঞানিকভাবে সুবিন্যস্ত। প্রথমতঃ আমাদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ আলাদা। তারপর উচ্চারণের দিক থেকে যে ধ্বনিটি আসা উচিত, ঠিক সেই ভাবে বিচার করে বর্ণগুলিকে সাজানো হয়েছে। এছাড়া উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী (অর্থাৎ মুখের যে স্থান থেকে কোন বিশেষ বর্ণ উচ্চারিত হয়, সেই অনুসারে) বর্ণগুলিকে (স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বা plosive গুলিকে) আলাদা আলাদা বর্গে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তারপর ব্যঞ্জনের অল্প প্রাণ এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিও ঠিক পর পর আছে। এমনকি স্পৃষ্ট ও উষ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনি পর্যন্ত আলাদা করা আছে। এমন সুনিয়মিত ও সুবিন্যস্ত বর্ণমালা

বাংলা তথা ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত বর্ণমালার মতো আর একটিও নেই।

বাংলা ভাষার আর একটি মস্ত গুণ এই যে, এই ভাষায় মানুষের উচ্চারিত প্রায় সব সাধারণ ধ্বনির জন্যই একেকটি করে বর্ণ আছে। সেজন্য অন্য ভাষার শব্দ বাংলায় লিখিতে গেলে বিশেষ অসুবিধা হয় না বা অক্ষর ধার করতে হয় না। আর আমরা মুখে যা উচ্চারণ করছি, তাই বাংলা বর্ণমালার সাহায্যে সঠিক ভাবে প্রায় হুবহু লিখতে পারছি। কোন ভাষার পক্ষেই এর চেয়ে বড় প্রশংসার কথা আর কিছুই হতে পারে না। অর্থাৎ বাংলা লিখন পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক দিক থেকে প্রায় সুসম্পূর্ণ একটি আদর্শলিপি পদ্ধতি।

বাংলা লিপিতে (Script) একটি অসুবিধে আছে, এখানে তা' আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। সেটি বাংলা যুক্তবর্ণ; একটা বর্ণ আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নতুন বর্ণ সৃষ্টি করে। এতে লিপি জটিল হয়ে যায়, ছাপাতে গেলে অনেক টাইপের দরকার হয়। প্রথমোক্ত অসুবিধে, অবশ্য প্রায় সব ভাষাতেই আছে। লিখতে গেলে একটা বর্ণ আরেকটার সঙ্গে জড়িয়ে যায়, সে জন্য ইংরেজী ছাপা থেকে হাতের অক্ষরই সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে; বাংলায় ছাপার অক্ষর প্রবর্তনের সময় অক্ষরের বা বর্ণের সহজ রূপটি গ্রহণ করলেই এই অসুবিধে সৃষ্টি হত না। এখনও তা' করা যায় এবং ক্রমে ক্রমে তা' করাও হচ্ছে—যেমন লাইনো মেশিনে করা হয়েছে। আর অনেক ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণ ইচ্ছে করলে অনায়াসে বিযুক্ত করেই লেখা যায়।

ঐতিহ্য এবং ভাষা-বিজ্ঞানের দিক থেকে বাংলা ভাষার এই শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহ। প্রবাদ আছে, সব ভাষাভাষীর কাছেই তার মাতৃভাষার বোল মিঠা লাগে। কিন্তু বাংলা ভাষার বোল এমনই মিঠা যে, বিদেশীরাও এর ধ্বনি মাধুর্যে মোহিত না হয়ে পারেন না।

আমাদের পক্ষে তো এই ভাষা মাতৃস্তন্য স্বরূপ। মায়ের বুকের

দুধ নইলে শিশুর প্রাণ ভরে না, তার দেহের যথার্থ পুষ্টি হয় না। আমরাও প্রাণবান মানুষ হয়ে বেড়ে উঠি বাংলা ভাষার রস পান করে। শৈশবে স্বপ্ন দেখেছি যে ভাষায়, কৈশোরে কল্পনার মায়াজাল বুনে এই দুনিয়াকে রঙ্গীন করে দেখেছি যে ভাষার আলেখ্যে—সে ভাষা আমাদের বাংলা। তাই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি—

মোদের গরব মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা।

ভাষার কথা

আহমদ শরীফ

কাছের মানুষকে আভাসে ইঙ্গিতে মনের কথা কাজের কথা হয়তো বুঝিয়ে দেয়া যায়, কিন্তু দূরের মানুষকে ভবিষ্যতের মানুষকে কাজের কিংবা মনের কথা কি ভাবে বলা যায়? এ সমস্যা একদিন মানুষকে বিব্রত করেছে! এর সমাধান পেয়েছে মানুষ মুখ নিঃসৃত ধ্বনি সৃষ্টি করে।

সেই আদিকালে এক জায়গায় বা এক গোত্রের মানুষ মিলে চুক্তি করেছে, অতঃপব বিশেষ বিশেষ ধ্বনি দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা ভাব কিংবা আচরণ নির্দেশিত হবে। যেমন 'গরু' বললে এক বিশেষ জীবকে বুঝব, 'ঘাস' ধ্বনিতে বিশেষ বস্তুকে নির্দেশ করব, 'সুন্দব' ধ্বনি দিয়ে এক বিশেষ ভাব ব্যক্ত করব, 'খাব' বলে এক বিশেষ উদ্দেশ্য জানিয়ে দেব, এ ভাবে মানুষের ভাষা সৃষ্টি হল।

তাহলে ধ্বনি আসলে বোবা। মানুষেব অভিপ্রায়ই তাকে অর্থ দান করে। ধ্বনিগুলোর অর্থবহতা একান্ত ভাবে স্থানিক বা গোত্রিক চুক্তি নির্ভর। এই জন্যই দুনিয়াতে এত ভাষা এবং একের ভাষা অপরের অবোধ্য। যে লোক যে ভাষাতে জন্ম থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়, সে ভাষাই তার মাতৃভাষা। সে ভাষা তাব দেহের রক্ত-মাংসের মতই একান্ত নিজেব। আমরা যা' কিছু অনুভব কবি, যা কিছু ভাবি, তা এই ভাষার মাধ্যমেই হয়। কাজেই ভাষা হচ্ছে জীবনানুভূতির বাহন, বেশী করে বললে বলতে হয়, ভাষাই জীবন। তা'হলে মাতৃভাষা থেকে বিচ্যুত হওয়া মানে অনেকাংশে জীবনকেই খণ্ডিত করা, ক্ষুদ্র কবা, হয়তো বা ব্যর্থ করা। কচ্ছপকে উল্‌টিয়ে দিলে যেমন সে না চলতে পেরে আর না খেতে পেয়ে মারা যাবে,

তেমনি মানুষের মুখের ভাষা—ভাব-ভাবনার ভাষা কোন কৌশলে ভুলিয়ে দিলে মানুষ হিসেবে তার অপমৃত্যু অনিবার্য।

এযুগে নয় শুধু, চিরকাল মানুষ অবচেতন মনে একথা উপলব্ধি করেছে। তাই প্রত্যেকের স্ব স্ব ভাষা এত প্রিয়। তিনটে ধর্ম দুনিয়াময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে; বৌদ্ধ-ধর্ম, খৃষ্ট-ধর্ম, এবং ইসলাম। বিজাতির ও বিদেশীর এসব ধর্ম মানুষ সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে, কিন্তু ধর্মের ভাষা কেউ নেয় নি, এসব ধর্ম ভাষা মন্দির-মসজিদ ও গীর্জার প্রাচীর পার হয়ে কারুর মুখের বুলি কিংবা মনের ভাষা হয়ে ওঠেনি এতকাল পরেও।

আগেই বলতে চেয়েছি, একটি বা একাধিক ধ্বনি সমষ্টিতে শব্দ, এবং শব্দের সংগে শব্দের সুযোজনায় ভাষা। ধ্বনি, শব্দ বা বাক্য বক্তার অভিপ্রায় অনুসারেই অর্থবহতা লাভ করে, নইলে ওগুলো বোবা। যেমন খা, যা, ধৃ, কৃ, 'হ' প্রভৃতি প্রকৃতি বা ধাতুমূল বক্তার কোন অভিপ্রায় নির্দেশ করে না, এগুলোর সঙ্গে বক্তার পরিচায়ক ও তার অভিপ্রায়সূচক পুরুষ (Person) কাল ও ভাব (Mood) জ্ঞাপক চিহ্ন যুক্ত হলেই তা অর্থবহ শব্দ বা পদ হয়। তেমনি 'মানুষ' শব্দের সঙ্গে বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ও কারক চিহ্ন যোগ করলেই তা' বক্তার অভিপ্রায়অনুগ কণ্ঠস্বরও উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হওয়া চাই, তা হলেই শব্দ বা বাক্য অর্থগ্রাহ্য হয়। লিখিত ভাষায় বিভিন্ন চিহ্ন যোগে এবং পৌর্বাপর্য সূত্রে এ অভিধা পাওয়া যায়, তাই আমরা বর্ণ-নির্ভর ভাষার অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই। অর্থাৎ বক্তার উদ্দিষ্ট অভি-প্রায় বুঝে নেই। যেমন বিভিন্ন চিহ্নযোগে একই শব্দের আদেশ, নির্দেশ, অনুনয়, প্রশ্ন, বিস্ময় প্রভৃতি সূচক অর্থ পাই। একটি দৃষ্টান্ত দেই: যাও। যাও! যাও? যাও ইত্যাদি চিহ্নযুক্ত 'যাঁও' পদটি বিভিন্ন অর্থ-ব্যঞ্জনা দান করছে।

অতএব আমাদের পুরোনো কথায় ফিরে যেতে হয়: "ভাষা হচ্ছে ভাবের বাহন। ভাবই আসল, ভাষা হচ্ছে আনুষঙ্গিক। ভাব

থাকলে ভাষা আপনিতেই আসে।" ভাব ও ভাষায় আধেয়-আধার সম্পর্ক। আধারের পরিবর্তনে 'আধেয়' আকৃতি বদলায়, প্রকৃতি হারায় না। অতএব, ভাষা গৌণ, ভাবই মুখ্য।

এই উক্তির সার্থকতা ইসলামের ইতিহাসেও পাই। নবলব্ধ ইসলামি ধ্যান-ধারণার প্রভাবে আরবী ভাষা পুরোনো কলেবরে নতুন অভিধা লাভ করে। এভাবেই আগুন-পূজক ইরানির ভাষা হয় ইসলামি। তারা আরবের ধর্ম নিল, কিন্তু নিজের ভাষা রাখল। তাই ইসলামের মৌল শব্দগুলোরও নিজেদের ভাষায় তর্জমা হল, তাতেই আরবের আল্লাহ, সালাৎ ও সিয়াম শব্দগুলো ইরানে হল খোদা, নামায আর রোযা।

এমনিই হয়। মাতৃ-ভাষায় তর্জমা না হলে কোন কথাই—কোন ভাব-ভাবনাই মনের কথা—প্রাণের কথা হয়ে উঠে না। তাই তর্জমার প্রয়োজন ও আয়োজন। তাই তথাকথিত হিন্দুর ভাষায় ইসলামী ভাষা বলে স্বীকৃত আরবী-ইরানী ও উর্দু কেতাব বাংলায় অনুবাদের প্রয়াস। আমরা তর্জমা করি, কেননা জানতে চাই, বুঝতে চাই। আমরা রচনা করি, কারণ আমরা নিজেদের জানাতে চাই, বোঝাতে চাই। অতএব, আমাদের শ্রদ্ধেয় হলেও ইসলামি ভাষাতে আমাদের অভিপ্রায় পূর্ণ হয় না, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই বিজাতির ও বিধর্মীর ভাষা বলে মেনে নিয়েও পবিত্র ইসলামের বাণী, মুসলিম-মনীষার ফসল না-পাক মাতৃভাষার মাধ্যমে পেতে চাই। নইলে হৃদয়ঙ্গম হয় না যে। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য ইসলামি বাণী ও বুলিকে পবিত্র রাখা নয়, মাতৃ-ভাষারই মাধ্যমে পরিপাক করা। কাজেই ভাষার ইসলামি রূপের কথা এক্ষেত্রে উঠানোই নিরর্থক।

আর একটি কথা বলেছি, আমরা কথা রচনা করি, কেন না, আমরা যা ভাবি যা জানি তা' অপরকে জানাতে চাই, অপরের হৃদয়-মনে সঞ্চারিত করে দিতে চাই। সে কি শুধু মুসলমানকে? সে কি কেবল স্বদেশবাসীকে? যদি বিশ্ববাসীকেও তা জানাতে চাই,

তা হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের আচারিক ও আনুষ্ঠানিক ইসলামের কথা আর কেউ শুনতে চাইবে না, তার বিশ্বজনীন মর্মবাণীই কেবল অপরকে আকৃষ্ট করবে। এর তাজা প্রত্যক্ষ প্রমাণ য়ুরোপ। সচেতন বা অচেতন ভাবে আমরা প্রতি মুহূর্তে য়ুরোপ থেকে মানস খাদ্য গ্রহণ করছি, কিন্তু 'ফিরিস্তানী'কে পরিহার করি এড়িয়ে চলি। অথচ ভাব জগতে যা' কিছু য়ুরোপের দান—তার কতকাংশ নাস্তিক্যজাত হলেও অধিকাংশ আস্তিক্য বুদ্ধির ফল। সে আস্তিক্য বুদ্ধি নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট-মত ভিত্তিক। তাদের আচারিক ও আনুষ্ঠানিক ধর্মবোধ ছাপিয়ে যা' বিশ্বলীন রূপ নিয়েছে, অর্থাৎ যা সর্ব মানবিক হয়ে উঠেছে, তাই আমাদের গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তাতেই আমাদের অধিকার বর্তেছে। অতএব, বিশ্বজনীন, মানবিক আবেদন সৃষ্টি করতে হলে আমাদের ইসলামি ভাব ও বাণীকে 'অপরূপ' করে তুলতে হবে, কেননা আগেই বলেছি স্থূল স্বরূপে তা' অমুসলিমের শ্রদ্ধা পাবে না। এ জন্যে আমাদের লক্ষ্য হবে—Form এর পরিচর্যা নয়,—Spirit এর প্রতিষ্ঠা।

আবার বলছি, শব্দ হল ভাষা সৌধের বাক্য-দেহের বোবা উপাদান। বক্তা বা লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী তা' অভিধা পায়। এজন্যে ভাষাভেদে শব্দ অর্থান্তর লাভ করে। যেমন, গৌরব—স্নেহ>Pride, শ্রদ্ধা—ইচ্ছা, আকর্ষণ>Respect, গঙ্গা—গঙ্গানদী, গাঙ যে কোন নদী, যবন–Ionian>মুসলমান, পাষণ্ড—ধর্ম সম্প্রদায়>দুর্বৃত্ত। এরূপ পঙ্কজ, গোপাল, করী। এছাড়া শব্দের একাধিক অর্থ-তো রয়েছেই। যে-কোন ভাষা সম্বন্ধে একথা সত্যি। আবার ভাব-বিবর্তনে অর্থাৎ নতুন ভাব চিন্তার অনুপ্রবেশের সাথে সাথে বাক্-ভঙ্গিও বদলায়। ভাষা ও ভঙ্গি যে একান্ত ভাবে বা লেখকের মনোভঙ্গির অনুগ, তার বিশিষ্ট প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রচনা। রবীন্দ্রনাথও পয়ার ত্রিপদীতে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু রূপে রসে আগের ও তাঁর সমকালের অনুরূপ কবিতার সঙ্গে এদের পার্থক্য

কত। কথায় বলে Style is the man তাই ব্যক্তিক ভঙ্গিই সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনে। আর 'ব্যক্তিক ভঙ্গি' বিশিষ্ট হয় কেবল তখনই, নতুন ভাব চিন্তার বীজ উপ্ত হয় যখন তার মনোভূমে।

মানুষের মনন চিন্তন নিত্য বিকাশমান। কাজেই তার নতুন ভাব-চিন্তা ধারণে সমর্থ পুরোনো শব্দগুলো স্ব অর্থে টিকে থাকে, অন্যগুলো হয় বাদ পড়ে নয়তো পুরোনো দেহে নব অভিধা নিয়ে বেঁচে থাকে। এতেও কুলোয় না, তাই অর্থ-গর্ভ ও ব্যঞ্জনাবহ নতুন নতুন শব্দ তৈরী হয়। সৃষ্টি করা প্রতিভা সাপেক্ষ, তাই প্রয়োজনে উদ্দিষ্ট ভাবসহ শব্দ অপর ভাষা থেকে ধার নিতে হয়। এভাবে সৃজন এবং ঋণে ঋকৃতে ভাষা পুষ্টি ও সমৃদ্ধি পায়। সভা করে এ গ্রহণ, বর্জন ও সৃজন চলতে পারে না। সৃষ্টির মুহূর্তে স্রষ্টার মন্ময় গরজেই তা' সম্ভব হয়। শব্দের এই অভিধা বিবর্তন ও শব্দ সৃষ্টির জগৎ এক বিচিত্রলোক। ব্যক্তিব ভাব চিন্তার ও অনুভূতি উপলব্ধির মানস সত্তার সংস্পর্শে শব্দ প্রাণময় ও বাঙ্ময় হয়ে উঠে। এ অনুভূত সত্য, কিন্তু অনির্বচনীয়। এ রহস্য একদা ভারতীয় ঋষিদের চমকে দিয়েছিল, তাই বিস্ময় বিমুগ্ধ ঋষি মুখে উচ্চারিত হয়, 'বাক ব্রহ্ম'— শব্দই ব্রহ্ম। শব্দের অবয়বে মানুষের ভাব সত্তা যে জীবন্ত মূর্তি পায় এবং সুবিন্যস্ত শব্দ যে অসামান্য শক্তির আধার হয়ে উঠে, আর এ জন্যেই 'বাক' যে জীবন নিয়ন্তা ব্রহ্মস্বরূপ, তা' ঋষিদের 'মন্ত্রদ্রষ্টা' খ্যাতি থেকেই বোঝা যায়। গুঞ্জন ও মুখরতাতেই বাক্যবদ্ধ শব্দের পরিচয়—বাক্যই মানসকে মূর্তি দেয় ভাবকে দেয় মুক্তি— এভাবে বাগ্বদ্ধ হয় মানুষের আন্তর্সত্তা, ফুটে উঠে জীবনের প্রতিচ্ছবি। ফলে ভাষা অনুভূত জীবনকে দেয় মূর্তি আর জীবনানুভূতিকে দেয় মুক্তি। এবং জীবন হচ্ছে জাগ্রত মুহূর্তের কতগুলো অনুভূতির সমষ্টি। তাই বলেছিলাম যেহেতু ভাষাই বোধের বাহন, ভাষাই জীবন।

দুটো কারণে শব্দের সৃজন ও ঋণ গ্রহণ চলে : নতুন ভাবচিন্তার

উদ্ভাবনে এবং বস্তুর আবিষ্কারে। স্বদেশে যদি নতুন ভাব চিন্তার উদ্ভব বা উন্মেষ হয়, কিংবা নতুন বস্তু তৈরী বা আবিষ্কৃত হয়, তা' হলে নিজের ভাষাতেই সে-মনন প্রকাশক বা সে-বস্তু নির্দেশক শব্দ তৈরী হয়। আর যদি বিদেশী ভাব বা বস্তু নেয়া হয়, তা হলে প্রাসঙ্গিক বিদেশী শব্দকে নিজের ভাষায় ঠাঁই দিতেই হয়। একে রোধ করতে যাওয়া যেমন নিরর্থক, এ গরজ ছাড়া বি-ভাষার শব্দ আনার অপচেষ্টাও তেমনি অসার্থক।

সবলের পরিচয় আত্মপ্রসারে আর দুর্বলের স্বস্তি আত্মগোপনে। সবল পরাক্রান্ত আর দুর্বল সন্ত্রস্ত। সবল জানতে চায়, জানাতে চায়, সে বুঝতে উৎসুক আর বোঝাতে প্রয়াসী। সে দিকে দিকে নিজকে ছড়িয়ে দেয়ার অভিলাষী, ব্যাপ্তিতেই তার আনন্দ, তার জীবনোল্লাস, তার আরাম। তাই মানুষের মানসোল্লাস আজ গ্রহে গ্রহে জীবন ও জীবিকার প্রসার খুঁজছে। দুর্বলের ধর্ম আত্ম সংকোচন আর সবলের বিলাস আত্মবিস্তারে। দুর্বল Self-Preservation-এ বা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত, আর সবল Self-expansion-এ বা আত্মপ্রসারে রত। দুর্বল স্থবির, সবল চঞ্চল। এক প্রাণহীনতায় অচল, অপর প্রাণ প্রাচুর্যে চঞ্চল। দুর্বলের নিয়তি আত্মবিলোপে, সবলের তৃপ্তি আত্ম উল্লাসে মহিমার উজ্জ্বলতা সাধনে। আত্মার অপমৃত্যুতে দুর্বলের লয়, আর আত্মপ্রতিষ্ঠায় সবলের জয়। তাই দুর্বলতা সমাজে ঘৃণ্য আইনে অপরাধ ও ধর্মে পাপ।

আমরা রেনেসাঁ-দীপ্ত জাগ্রত জাতি। আমাদের তো দুর্বলতা থাকার কথা নয়। তাহলে আমাদের ডর কিসে, আমাদের ভয় কাকে? দ্বন্দ্বে ভীত হয় কারা? আমরা তো দুর্বল নই। আমাদের তো দেবার নেবার পালা সবে শুরু হল। এ বেনে যুগে মানস-বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়লে কিংবা তাল ঠুকে চলতে না জানলে আমাদের 'জান' নিয়ে যে টানাটানি পড়বে, তাতে 'জান' যদি বা বাঁচে 'মন' নিশ্চিতই হারাব। উঠতির লক্ষণই হচ্ছে নির্ভিকতা,

উদারতা, প্রাণময়তা, মুখরতা, জিজ্ঞাসা, কর্মনিষ্ঠা ও চিন্তা-ভাবনার প্রবহমানতা। আমরা নতুন জাতি, আত্মব্যাপ্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠাই আমাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ব্রত। এত কালের আত্ম-সংকোচন ও জড়তার গ্লানি মুছে আত্ম প্রসারে ব্রতী হওয়াই তো কাম্য।

যে প্রসঙ্গে এ আবেগের বন্যা ছুটল সে কথাই বলি ঃ বুতপরস্তের আরবী, আগুন-পূজকের ইরানি এবং পৌত্তলিকের উর্দ্দু [ভাষা-বিজ্ঞান মতে বাক্যরীতির (Syntax) ধরন দিয়েই ভাষার জাত বিচার হয়, এই দৃষ্টিতে উর্দ্দু ভারতীয় আর্য ভাষাভুক্ত] যদি ইসলামি ভাষায় পরিণত হতে পারে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা অবিকৃত ভাবেই ইসলামি হতে বাধা কি? মুসলমানের মাতৃ-ভাষা, মুখের বুলি হিন্দুয়ানি হতে পারে? আমরা না বলি—

চীন ও আরব হামারা
হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হায় হাম
ওয়াতান হায় সাঁরে জাহাঁ হামারা।

পরিবর্তনের মুখে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিশেষ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, দিনানুদৈনিকতার বৈচিত্র্যহীন গ্লানি ও নিস্তেজক শ্রমে সে দিনটি ক্ষনিকের জন্য হলেও একটি বিরামচিহ্ন টানে, নিজ নিজ খাদ থেকে তখন আমরা বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ পাই। একুশে ফেব্রুয়ারীও সেদিক দিয়ে বিশিষ্ট। সমাজ ও সংস্কৃতির সামনে পেছনে তাকিয়ে দেখবার একটা সুযোগ দিনটি আমাদেব এনে দেয়।

এবং মুখ তুলে তাকালে নিশ্চয়ই দেখব গত সতের বছরে পুরাতন সমস্যা সমাধানের যেমন চেষ্টা হয়েছে তেমনি নতুন অনেক সমস্যাও বড় হয়ে উঠেছে।

যেমন শিক্ষার সমস্যা। এ কথা আজ অবশ্যিই বলা চলে যে, নিরক্ষরতার অন্ধকারটা যেমন রূঢ় সত্য, তেমনি সত্য তার অপনয়নের চেষ্টা। বরং চেষ্টাই বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভবিষ্যৎ তারই হাতে। অন্ধকারের হাতে বর্তমান ?বলিত বটে, কিন্তু তার মুখ পেছন দিকে। ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে সে পিছিয়ে যাচ্ছে। লেখাপড়ার সঙ্গে গাড়ী-ঘোড়ার যোগাযোগটা পরীক্ষিত সত্য, তাই তার প্রতি লোকের আগ্রহ অপ্রতিরোধ্য। সন্তানকে সুশিক্ষিত করবেন এই সঙ্কল্পে এদেশেব মলিনমুখ পিতা মাতারা যে আত্মত্যাগে প্রস্তুত ও নিয়োজিত তা সামান্য নয়।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকে। ধরা যাক পিতা মাতার আত্মত্যাগ বৃথা গেল না। মেধাবী ও সম্ভাবনাসম্পন্ন ছেলেটি লেখা-পড়া শিখল এবং বাপ-মায়ের স্বপ্ন সার্থক করে সত্যি সত্যি গাড়ী ঘোড়ায় চড়ল। কিন্তু তারপর? সে গাড়ী ঘোড়া কি তার বাপ মায়ের কাজে লাগবে,

যারা গ্রামে থাকে এবং যারা একদা জমি বেচে ছেলের বই-পত্র পোশাক-আশাকের জন্য টাকা পাঠিয়েছিল ? শিক্ষাজীবন শেষে ছেলেটি কর্মজীবনে প্রবেশ করবে, কোথায় ? নিশ্চয়ই শহরে, দূরে, বাপ মায়ের নাগালের বাইরে। এমনও হতে পারে, আরো বেশী বিদ্যার আকাঙ্ক্ষায় সে বিদেশে গেল পড়তে। তারপর সে অনেক জায়গায় ঘুরবে ; কিন্তু কখনো কি আর ফিরে যাবে গাঁয়ের সেই নড়বড়ে বাড়ীটাতে ? অভিজ্ঞতা বলছে, যাবে না, যেতে পারবে না। সে বরং নতুন করে নিজের এক ভুবন গড়ে তুলবে।

উদ্বিগ্ন সমাজহিতৈষী একে বলবেন উৎকেন্দ্রিকতা, বলবেন শিক্ষার স্ববিরোধিতা। এইখানে, শিক্ষা মানুষকে সমৃদ্ধ করছে আবার সেই সঙ্গে নির্মমভাবে নিজের পরিবেশ থেকে, পরিবেশের সঙ্গে জড়িত পারিবারিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ থেকে নব্য-শিক্ষিতদের উপড়ে ফেলছে। মানসিক দিক দিয়ে এতে করে এক নতুন বাস্তুহারা শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে। তাতে একটা সঙ্কটের আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

যাচ্ছে সত্যি, কিন্তু তবু পরিবর্তনটা অনিবার্য। ব্যাপারটা কৃত্রিম মনে হতে পারে, তবু ঘটনাটা বাস্তবিক। আমরা অপছন্দ করতে পারি, পিতা মাতা চোখের পানি ফেলতে পারে, পড়শী প্রতিবেশীরা ছি ছি করতে পাবে, কিন্তু তবু সমস্যাটা থাকছেই। গ্রাম থেকে অহরহ লোক শহরে চলে আসছে আর তারই সমান্তরাল নব্য-শিক্ষিতরা পুবাতন সংস্কার ও পরিবেশ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন, একদিনে নয়, দিনে দিনে, প্রক্রিয়া পথে এবং শারীরিকভাবে যত না তার চেয়ে অনেক বেশী মানসিকভাবে লোকের গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার সঙ্গে এব তফাৎটা এইখানে যে, এতে পিছু টানটাকে সচেতনভাবে পরিহার করা হয়, তাকে বিনষ্ট করা হয় উৎসাহের সঙ্গে, তা না হলে এও একই রকম ভাবে অনিবার্য।

অনিবার্য এই কারণে শিক্ষার নতুন আলোক আমাদের মনে দুই

ধরনের মানসিকতা একই সঙ্গে সৃষ্টি করছে। প্রথমতঃ, হীনমন্যতা-বোধে। যখন তার চোখ খুলল, ময়ূরকে দেখল রঙ্গীন হয়ে নৃত্য করতে, তখন কাকেরও বাসনা সে ময়ূর হবে, তারও প্রবল অসন্তোষ নিজকে নিয়ে। এবং যেহেতু সে ময়ূর নয়, তাই তার অতি অভিনয়, যার জন্য সে ধরা পড়ে যায় হয়ত। অন্যরা 'টের পায় সে খাঁটি নয়, তবু যেহেতু সে হীনমন্য তাই অতি অভিনয় তাকে করতেই হয়। এই অতি উৎসাহ দ্বিতীয় মনোবৃত্তির লক্ষণ ; এই মনোবৃত্তি হল অহমিকা। বিদ্যার্জন একটা নতুন অভিজ্ঞতা, তাই বোধ করি গুরুপাক ; চোয়ালও শক্ত হয়ে ওঠেনি—যে চর্বিত হবে। এর ফলে বিদ্যার্জনে যে বিশিষ্টতা অর্জিত হল সেটা দেমাক হয়ে দেখা দিতে চায়। এমনিতে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও হীনমন্যতা ও অহমিকার এই দ্বৈত চেতনা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে আসছে এবং দুয়ের মিলিত প্রক্রিয়ায়—প্রথমের প্ররোচনার ও দ্বিতীয়ের টানে আমাদের আজন্ম পরিচিত জগতের বাইরে যেয়ে পড়ছি আমরা। এবং একটা কৃত্রিম, অস্বাভাবিক, নতুন ভুবন তৈরীর চেষ্টা করছি যার উজ্জ্বলতা ও নতুনত্ব তার প্রধান গৌরব বলে চিহ্নিত। পুরাতন পরিবেশ ও প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে এই নতুন ভুবনের দূরত্বটা যেমন আপাতঃ তেমনি অন্তর্নিহিতও বটে। নিন্দিত পোশাক ও আচরণের ইদানীন্তন উগ্রতায় এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে একটি প্রকাশ্য আছে বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু এর প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্যি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও নিষ্প্রাণ হৃদয়ানুভূতি। বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, কিন্তু হৃদয়ের চর্চা হয়নি—একটি তীক্ষ্ম, অপরটি স্থূল, অর্থাৎ যে সকল অনুভূতিকে আমরা সচরাচর মানবিক বলি এই নতুন জগতে তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, তারা বরং অপসারিতই হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। লেখা পড়ায় যে গাড়ী ঘোড়ায় চড়ার উপরই জোর পড়ছে, উপেক্ষিত হচ্ছে নিরাসক্ত হৃদয়চর্চা—এ তারই পরিণতি। গ্রন্থকীট হওয়া অবশ্যিই খারাপ কিন্তু তার প্রতি বিতৃষ্ণাও ভালো নয়।

আর এখানেই বই'কে আজ বড় একটা ভূমিকা নিতে হবে পাঠ্য বইয়ের কথা বলছি না। বলছি সাহিত্যের বইয়ের কথা এবং বিদেশী বইয়ের নয়, দেশী বইয়ের। তেমন ধরনের বইয়ের যা আমরা অল্পবয়সে পাঠ্য বইয়ের নীচে লুকিয়ে রেখে পড়ি, পড়ে কাঁদি, আর পড়ি জানলে হিতৈষীরা কুপিত হয়, দ্বিতীয় শর্ত, যে বইতে আমাদের আজন্ম পরিচিত জগৎ বাস্তবের চেয়ে সত্য হয়ে রূপায়িত হয়েছে। সে বই অবশ্যিই সাহিত্যের বই—সে মিথ্যা কথা বলে সত্য, কিন্তু তেমনি মিথ্যা যা ইতিহাসের চেয়ে বেশী সত্য ও স্থায়ী। কেননা কেবল মাত্র এই ধরনের বইয়ের ক্ষমতা আছে শিক্ষিত মনে হৃদয়ানুভূতির সঞ্চার করার, তেমন অনুভূতির যা মানুষকে অন্য মানুষের কাছ থেকে দূরে সরায় না বরং ভালোবাসতে শেখায়। সন্দেহ নেই হীনমন্যতা ও অহমিকার বিনষ্টিতে ভালোবাসার মত বেশী কার্যকরী আর কিছু নয়। ভালোবাসা কূটবুদ্ধির কুটিল তর্ক কি অনুশাসনের পরোয়া করে না। সে অলক্ষ্যে অজান্তে আপনার কাজ করে যায়। এই বোধ জন্মাতে পারে সাহিত্য। সেই সঙ্গে পরিবেশের সাথে পরিচিতও করবে সে, পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার অন্তর্ভুক্ত করবে আমাদেরকে। অন্য সব ক্ষেত্রে যেমন এই সংযুক্ত থাকার বেলাতেও তেমনি, শিকড়গুলোর গোড়ায়, সংযোগ গ্রন্থির ভিতে নিয়মিত উর্বরা শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন। অনাহারে মৃত্যু অবধারিত। নব্যশিক্ষিতদের ভেতর যে সুপ্ত মানুষটি রয়েছে তাকে জাগাতে হলে বইকেই ব্যবহার করতে হবে উপায় হিসাবে। অন্য কিছুর আবেদন ঐ নতুন ভুবনে প্রবেশের পথ জানে না।

কিন্তু শুধু শিক্ষাই নয়, উৎকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হচ্ছে বিত্তের কারণেও। শিক্ষার মত, অর্থোপার্জনও নবীন অভিজ্ঞতা, তাই সে ক্ষেত্রেও অহমিকাটা আছে। তার বিজ্ঞাপন বরং আরো বেশী জমকালো, জৌলুস অধিকতর দেদীপ্যমান। বিত্তবানের জগৎও পরিবেশবিচ্ছিন্ন, উত্তেজনাপ্রিয়, কোথাও কোথাও বিরক্ত এবং সর্বত্র

সুকুমার বৃত্তির চর্চার দিক দিয়ে দুর্বল। সাহিত্যের বইয়ের পক্ষে এও একটা সম্ভাবনাময় কর্মক্ষেত্র।

আমাদের সাহিত্য অবশ্যি এ বিষয়ে ততটা ভাবেনি যতটা তার ভাবা উচিত ছিল। বরং অনেক প্রশ্নে অনর্থক তর্ক করেছে। যেমন ভাষা। আরবী-উর্দ্দু শব্দের প্রয়োগ ও প্রয়োগে বিরোধিতা নিয়ে আমাদের লেখকরা সময় নষ্ট করেছেন, ওদিকে ভাষার ক্ষেত্রে নতুনতর উৎকেন্দ্রিকতা যে এসেছে তার খেয়াল রাখেন নি। সমাজে আজ ধনী-নির্ধনের ব্যবধানটা যত স্পষ্ট, দুই শ্রেণীর ভেতর ভাষার পার্থক্যটা তার চেয়ে কম নয়। ভাষা অবশ্যি মানুষের দাস, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের ছাপ তার চেহারাতে পড়বেই। এমনকি দারিদ্র্য অপনয়নের ফলে যে সমস্ত দেশে উচ্চবিত্ত নিম্নবিত্তের তফাৎটা ব্যবহারিক জীবনে আজ আর তেমন প্রবল নয় সেখানেও সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ও দূরত্ব শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণকে আশ্রয় করে টিকে থাকবার চেষ্টা করছে। ঐ কারণেই বাংলা দেশে এক সময়ে উর্দ্দুর ব্যবহার ছিল, ধারণা ছিল তাতে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মহিমায় ভূষিত করা সম্ভব হবে। প্রয়োজন ও বিলাসের ক্ষেত্রে পশ্চিমের অবদানগুলোর সঙ্গে আজ এসেছে তার পরিভাষা, ক্রিয়া পদগুলো দেশী থাকলেও বিশেষ্য, এমনকি বিশেষণগুলো ক্রমশঃ বৈদেশিক হয়ে উঠছে। সে ভাষাই আদর্শ, কেননা সমাজে, সংস্কৃতিতে প্রশাসনে এই ভাষার লোকদের একচেটিয়া অধিকার। যে ভাবে গ্রাম থেকে লোকে শহরে ছুটছে, শহরের লোকেরাও তেমন আগ্রহ নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে এই ভাষার দিকে। সাহিত্যের পক্ষে এই বিষয়টি অবশ্যিই বিবেচনাযোগ্য। আরো বিশেষ করে এই কারণে যে, সমস্যাটা শুধু ভাষাগত নয়, সংস্কৃতি ও সমাজগতও।

সামাজিক পরিবর্তনের আরো একটি লক্ষণ আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের আবির্ভাব। ব্যাপকভাবে সে এখনো আসেনি, যতটা হলে আনন্দের কারণ হত ততটা প্রভাবশালী হয়ত সে এখনো হয়ে

ওঠেনি। কিন্তু তবু সে আসছে, আসবে এবং যতই ভেতরে আসবে ততই আমাদের মঙ্গলের কারণ হবে। কেননা বিজ্ঞানের কল্যাণকর দিকটা দারিদ্র্যের জাতশত্রু। মানুষের সে শক্তি বৃদ্ধি করে, দুঃশাসন প্রাকৃতিক জগৎকে সে বশে আনে। এই হিসাবে বিজ্ঞান মানুষের হারানো স্বর্গ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা মাত্র—সেই স্বর্গ যেখানে প্রকৃতি মানুষের অনুচর ছিল এবং যেখান থেকে সে পতিত হয়েছে জ্ঞানের লোভ করে। এই কল্যাণকব বিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখা কারিগরি বিদ্যা আমাদের দেশে যার কাজ শুরু হয়েছে, আওয়াজ কানে এসে লাগছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও শিল্পায়িত ও বৈজ্ঞানিক পশ্চিমের দেশগুলোর অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে দেখে একটা প্রশ্ন করতে পারি। ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা পাশ্চাত্ত্যে যে এক ধরনের যান্ত্রিকতা—যাকে আমরা বলি বস্তুতান্ত্রিকতা এবং যাব বরাত দিয়ে আমরা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার আত্মসন্তুষ্ট প্রচেষ্টা করে থাকি—সৃষ্টি করেছে তেমন অভিজ্ঞতাকে কি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর? জবাবটা সোজা, সম্ভবপর হবে যদি কারিগরদের পাঠ্য তালিকার বহির্ভূত সাহিত্যের বই সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও কায়িক কৌশলের এই বর্ধিষ্ণু রাজ্যে হানা দিতে পারে, বই যদি পারে বিজ্ঞানের মাটিতে হৃদয়ানুভূতির সবুজ গাছের চাষ করতে।

একটি দ্বিতীয় ঝুঁকিও আছে। বিজ্ঞানের সার্বিক ব্যবহারের ফলে পশ্চিমি সংস্কৃতির দ্বিধাবিভক্তিকরণ ঘটেছে—একদিকে আছেন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অন্যদিকে বিজ্ঞানী ও কারিগর। দুয়ের ভেতর মানসিক আদান-প্রদানের সূত্রগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং পারস্পরিক দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে। ফলে বিজ্ঞান সাহিত্য-শিল্পকে অহেতুক মানসকণ্ডুয়ন বলে জানে আর সাহিত্য শিল্প অবজ্ঞাসূচক অভিমানে মানুষের আদিম অবিবেচক প্রবৃত্তিগুলোকে নিজের উপজীব্য বলে বেছে নেয়।

এই পরিস্থিতি আমাদের দেশেও সৃষ্টি হবে হয়ত। বিজ্ঞানের

সম্মান ও প্রতিপত্তি না বেড়ে পারে না—কেননা সে সম্পদের সৃষ্টি করতে জানে, দেশের উন্নতি তার উপরই অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইতিমধ্যেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও চটপটে ছেলেটিকে আমরা বিজ্ঞান পড়তে পাঠাতে শুরু করেছি। এবং সঙ্গত ভাবেই তার জন্য বেশী খরচপাতি করছি। বিজ্ঞান-পড়ুয়ার গুরুত্ব দিনে দিনে আরো বাড়বে। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের উপরও বিজ্ঞানীরা হাত দেবে, তাৎপর্যপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে বিশেষজ্ঞদের মুখের দিকে এর পরে আমরা আরো বেশী করে চাইতে শিখব। তখনি হয়ত দেখা যাবে বিশেষজ্ঞরা সাহিত্য বিমুখ হয়ে উঠছেন, আর সাহিত্যিক শিল্পীরা আত্মাভিমানী।

সে অবস্থা এখনো আসেনি, কিন্তু আসার আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া বুঝি বুদ্ধিমানের কাজ। প্রস্তুতি হোক, কি কাজে লাগাই, এখানেও বইয়ের ভূমিকাই প্রধান। নব্য-শিক্ষিতদের বেলাতে যেমন, বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও তেমনি, বই-ই পারে হৃদয়ানুভূতিকে সক্রিয় রেখে মানুষকে তার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ঘেরাদেওয়া জগৎ থেকে বার করে এনে অনেক মানুষের সঙ্গে মিলিত করতে। তদুপরি পরিবারের এক ভাই যদি হয় সাহিত্যিক অন্যজন কারিগর, তাদের ভেতর সকল পার্থক্যের অন্তরালে একটা সমচিন্তা যদি গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সে কাজ পারে পারিবারিক পাঠাগার, রক্তের বন্ধন থাকা সত্ত্বেও যদি দূরত্ব সৃষ্টি হয় তাহলে তা ঘোচাতে পারে একই ধরনের পুস্তকপঠন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা ও সম্বিৎ।

সামাজিক পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বইয়ের এই ভূমিকাটির দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন। এমনিতে বই আমাদের ব্যক্তিগত সঙ্গী—বউদের চাইতেও দরদী, কুকুরদের চাইতেও বিশ্বাসী—বইকে আমরা নিজেদের মত করে নিভৃতে পড়ি। কিন্তু বই পড়ার সামাজিক দিকটা উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে আমাদের সমাজে। তার মানে বইয়ের উপর একটা অতিরিক্ত কর্তব্য

বর্তেছে—শিক্ষা, ধন ও বিজ্ঞানচর্চার বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলার।

সে কর্তব্য পালনে বই (অর্থাৎ বইয়ের লেখকরা) কতটা সফলকাম হন সেটা আমাদের দেখতে হবে, নিরাসক্ত দর্শক হিসাবে নয়, কেননা এর সঙ্গে আমরাও জড়িত, আমরা প্রত্যেকেই। আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ভবিষ্যৎ চরিত্র এর উপর অনেকখানি নির্ভরশীল।

একুশের নাটক

ক ব র

[মঞ্চে কোনরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।

দৃশ্য : গোরস্তান। সময় : শেষ রাত্রি।

তিন চার ফুট উঁচু একটি পুরু কাল কাপড়ের মজবুত পর্দার দ্বারা মঞ্চটি দুই অংশে বিভক্ত, লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনের অংশে কি ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে ; কিন্তু বিভক্ত মঞ্চের পশ্চাৎ অংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকের চোখে পড়িবে না।

পর্দা উঠিলে দেখা যাইবে খালি মঞ্চের ডান কোণে একটি লণ্ঠন টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। সামনে একটি মোটা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ, মুখ খোলা। পাশে একটি ছোট গ্লাস, খালি। একটি রুমাল মাটিতে পাতা রহিয়াছে। মনে হয়, এই মাত্র তাহার উপর কেহ বসিয়াছিল। এই লোকটিই মঞ্চের ভিতরে আবার ঢুকিল। হৃষ্টপুষ্ট বড়-সড় শরীর। চালচলন গণ্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ। ভিতরে ঢুকিয়াই আবার ডাকিল—]

নেতা। গার্ড! গার্ড!

[নীল কোর্ত্তা, পাজামা পরা গার্ডের প্রবেশ। পায়ে খয়েরী ক্যাম্বিসের জুতা। পাজামার প্রান্তদেশ মোজার মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভুভক্তির ঝলক ; কিন্তু আপাততঃ একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্ত্তভাব। হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিয়া প্রবেশ]

গার্ড। জী-হুজুর! [দ্রুত নিঃশ্বাস]

নেতা। কি রকম গার্ড দিচ্ছ? তোমাদের পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা? ছিলে কোথায় এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে ডাক্‌ছি কোন সাড়া নেই।

গার্ড। পরথম পরথম ঠাওর করতে পারি নাই হুজুর। এমন ঠাণ্ডা আর আন্ধার হুজুর যে, কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ করে।

নেতা। তোমার পোষ্টিং কোথায় ছিল?

গার্ড। ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনারের শেষ লাল বান্ধানো কবরের পাড়।

নেতা। ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছো? বাহাদুর গার্ড দেখছি। বাতি নিভিয়ে রেখেছ কেন?

গার্ড। [চমকাইয়া হাতের লণ্ঠন দেখে] ওহ! এ্যা পইড়া গ্যাছলাম। তারাতাবি কইরা আইতে গিয়া পইড়া গ্যাছলাম। গর্তের মধ্যে।

নেতা। গর্তে?

গার্ড। কবর। পুরান কবর হইব। একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই একদম ভস্ কইরা ভিতরে ঢুইকা গেছি।

নেতা। Idiot! চোখ মেলে পথ চলো না? খেলার মাঠ পেয়েছ না কি? এটা গোরস্থান! সাবধানে পা ফেলতে পার না? যাও। ডিউটিতে যাও।

[অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোট-মাফলার-চাদরে জড়ানো কিম্ভুতকিমাকার এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ্য করে নাই।]

গার্ড। জী-হুজুর। [স্যালুট]

নেতা। যাওয়ার পথে আবার আরেকটার মধ্যে পোড়ো না। কাতার দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোন কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম। বাতিটা জালিয়ে নিও।

গার্ড। জী হুজুর। [স্যালুট। প্রস্থান]

ব্যক্তি। [নেতার পিছন হইতে] তখনই বলেছিলাম স্যার এসব আজেবাজে লোক—

নেতা। [চমকাইয়া] কে ? তুমি কে ?

ব্যক্তি। আমি স্যার, ইন্সপেক্টর হাফিজ।

নেতা। ওহ্! আপনি! এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চম্‌কে উঠেছিলাম। ভবিষ্যতে এরকম আর করবেন না। না, ভয় পাই নি। গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারে নি। তবু ডাক্তার বলেছে আমার নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কি বলছিলেন বলুন—

[বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট ফোলিও ব্যাগটার মুখ খুলিবে। ইন্সপেক্টর হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নজর পুরাপুরি নেতার হাতের দিকে।]

হাফিজ। এই বলছিলাম, এ সব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পারতেন। কাজ বানাবার চেয়ে পণ্ড করাতেই বেটারা বেশী পটু।

নেতা। তা হোক। ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটতো না।

হাফিজ। এ'টা স্যার ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামীর বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবী হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এ জন্যেই ত আজকাল কোন অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এ-গুলো খুঁজে পাবেন না স্যার!

নেতা। হুম্ [ব্যাগটা আবার দেখেন। চারিদিকে কি যেন খুঁজিতেছেন।]

হাফিজ। তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা

করতে নেই। তাছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডের কোন দরকার ছিল না। কটাই বা লাশ আর! গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তার ওপর শীতের মধ্যে আপনি কষ্ট করে—

নেতা। কিছু কাজ আছে যা' অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন! [দাঁড়াইয়া পড়িয়া খুঁজিতে থাকে]

হাফিজ। কিছু খুঁজছেন স্যার?

নেতা। হ্যাঁ। একটা বোতল, ঐ গ্লাসটার পাশেই ছিল। ভূত-জিনে আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করলেও, তারা কেউ এসে একেবারে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ করে যাবে—মনে হয় না। একটু আশে-পাশে খুঁজে দেখুন ত, আমিই ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি!

হাফিজ। ব্যাগের ভিতর পুরে রাখেন নি ত?

নেতা। না। ওগুলো ভরা বোতল। এটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ। ওহ! তাইতো। এ-তো বড় সাংঘাতিক কথা! না না। ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার। বোতলটা কি রকম স্যার?

নেতা। না খেয়ে থাকলে বোঝান যাবে না।

হাফিজ। না স্যার, মানে স্যার আমি, বোতলটার শেপ—গড়নের কথা বলছিলাম।

নেতা। ওহ্! খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোজ করুন।

হাফিজ। [দর্শকদের দিকে পিছন দিয়া, মঞ্চের অন্য কোণে উপুড় হইয়া কি খোঁজে। তারপর মাটিতে একবার হাত ঠেকাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠে।] পেয়েছি! পেয়েছি! স্যার! এই যে! এইটে না স্যার? [একটি খালি মদের বোতল তুলিয়া দেখায়।]

নেতা। অত জোরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চার পাঁচ বছরের মধ্যে কোন দিন ভয় পাই নি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্থান। খেলার মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে। আপনাকেও বলেছি একবার। দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ। কিন্তু, মানে, একদম খালি যে স্যার!

নেতা। তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতল শুদ্ধো সাবাড় করতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদের জন্যে—এরকম জায়গায় সুখের কথা। অন্ততঃ ভয়ের কথা নয়।

হাফিজ। ভয়? কি যে বলেন স্যার! মানে আমি ভেবেছিলাম হয়ত এমনিতেই কারো পায়ের ধাক্কা লেগেই ছিটকে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব হয়ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ঐ গার্ড ব্যাটার কাণ্ড। কবরের গর্ত্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের ওপরই হয়ত আবার হোঁচট খেয়েছে। অমন দামী জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যার!

নেতা। আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েৎ সরকারী কর্মচারী। এত দরদী লোক বুঝিনি।

হাফিজ। সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে এক্কেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা। আপনার এ চাকরী নেয়া সার্থক হয়েছে। এবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। আপনার পা শুদ্ধো কাঁপছে।

হাফিজ। অ্যা! পা? টলছে—মানে, কাঁপছে? ওহ! হ্যাঁ, তাইতে ইস্ কী বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, এ্যা?

[নেতা তখন হোৎকা পোর্টফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।]

নেতা। ওদিককার কাজ কত দূর এগুলো? আর কতক্ষণ দেরী হবে?

হাফিজ। প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণে সব চুকে যেত। দু-একটা গোলমালে কাজে বাধা না পড়লে—কখন সব শেষ করে ফেলতাম!—

নেতা। গোলমাল! এখানেও গোলমাল? গোরস্থানের মুর্দ্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?

হাফিজ। কি যে বলেন স্যার! ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু' একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরী হয়ে গেল।

নেতা। আপত্তি? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোন গোলমাল করেন নি ত? আপনাকে তো বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়েও বেশী ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেবো। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হয় কেন? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ। সে কি স্যার আমি বুঝিনি? সরকারের কাজে সরকারী টাকা খরচ করতে আমি পেছ-পা হব কেন? তবে ঐ ছোট-লোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা—তাইতেই'ত যত ফ্যাঁকড়া বাধে। মজুরী ত ষোল আনা আদায় করবেই, তার ওপর ধর্মের নাম করে সাত রকম ফষ্টি নষ্টি! কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার!

নেতা। আমার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কি ঘটেছে তাই বলুন।

হাফিজ। হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনে হেঁচড়ে গাড়ীতে তুলতে হয়েছে। তার ওপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায় নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু, মড়াগুলোকে কেটে কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা। এসব কাজে নার্ভাস হলে এতবড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হচ্চে

পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি, আমার হার্ট একটু উইক। বেশী ষ্ট্রেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেঁটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ। যা হবার তাই হয়েছে। টানা হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ীর মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরাগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আর বোঝবার উপায় নেই, কোনটার সঙ্গে কোনটা যাবে।

নেতা। তাতে কি হয়েছে। [নূতন বোতল খুলিবে]

হাফিজ। আরেকটা খাচ্ছেন স্যার? মানে, তাই দেখে আমি গোর-খুঁড়েগুলোকে বল্লাম আলাদা আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কি দরকার। একটা বড় মতোন গর্ত্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়।

নেতা। Resourceful officer! আপনার নামটা মনে রাখতেই হবে! সকাল বেলাই একবার পার্টি হাউসে আসবেন, রিকমেণ্ডেশন লিখে দেবো।

হাফিজ। মেহেরবানী স্যার! পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসাররাই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে, আমাদের এখনও সেই দশা! যদি আপনারাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান আমরা বাঁচব কি করে? আমাদের তো কোন রাজনীতি নেই স্যার! সরকারই মা বাপ! যখন যে দল হুকুমত চালায়, তার হুকুমই তামিল করি।

নেতা। এর মধ্যে গোলমালটা কিসের? আপত্তি উঠলো কোথায়?

হাফিজ। এ্যা? ওহ্! ইয়ে—মানে, ঐ গোরখুঁড়ে। বজ্জাত

ব্যাটারা বলে কিনা "কভি নেহী।" বলে কিনা 'মুসলমানের মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই।—তার ওপর একটা আলাদা কবর পর্যন্ত পাবে না? এ হ'তে পারে না, কভি নেহী!" গোঁ ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।

নেতা। আহাম্মকী করেছেন। সরকারী কাজ করেন কিনা! পাবলিক সেন্টিমেণ্ট বোঝেন না। বোঝাতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশীমত কাজ করতে দিলে আপনার ইজ্জত ডুবত? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনার কারবার। সমাজ সংস্কারের বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে সরকার বেতন দেয় না। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে—আজান পড়বে—কারফিউ শেষ হবে। লাশগুলো নিয়ে আপনি এখনও মিটিং করছেন?

হাফিজ। আমি স্যার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

নেতা। তা'হলে এতক্ষণ দেরী হচ্ছে কেন?

হাফিজ। ঐ তখনই ত স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাকড়া বাধল। কোত্থেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

নেতা। কে? তোমাকে এতবার করে বলছি, দম্‌কা দম্‌কা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবে না। ধড়াক করে বুকে লাগে। যা বলবার তা অত নাটক করে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পার না। [বুকে হাত বুলাইয়া] এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার? কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি। কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কি করে? গার্ডগুলো কি করছিল?

হাফিজ। এখানেই থাকে স্যার। গোরস্থানের বাইরে কখনও যায় না বলেই ত ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল। বদ্ধ পাগল।

নেতা। হুম।

হাফিজ। লোকটা এমনিতে ভাল লেখা পড়া জানে। ভাল আলেম। গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করত। তেতাল্লিশের ছুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলে মেয়ে মা বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতের বেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে : মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্র্যাজিক স্যার।

নেতা। অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ। চাকরী। চাকরী স্যার। চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা। বেশী খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসেছেন। মেহেরবানী করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি গোলমালটা কিসের! লাশগুলো মাটি চাপা দিতে এত দেরী হচ্ছে কেন? ঠাণ্ডায় আপনার মগজ জমে গেছে। কেবল এলোমেলো বকছেন। নিন। [বোতলটা আগাইয়া দিয়া] এক চুমুক টেনে নিন। শরীব গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ। আপনার সামনে স্যার? তার ওপর স্যার এখন অন-ডিউটি—

নেতা। তাকাল্লুকের সময় নেই। লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ঢিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। এক চুমুক টেনে চট্‌পট্‌ কাজটা শেষ করে ফেলুন?

হাফিজ। বোতলে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার?

নেতা। কেন, চুস্‌নি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি ?

[হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানে টানে একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঢক্‌ করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্‌ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া—]

হাফিজ। এ মালটা স্যার আরো ভাল। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা। মুর্দা ফকির লাশগুলো দেখেছে ?

হাফিজ। এ্যা ! ওহ হ্যা, মানে না। বোধ হয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলা ফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোত্থেকে হঠাৎ হুস্‌ করে একেবারে সামনে এসে পড়ে। বোধ হয়, আড়াল থেকে গোর খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপর কি তুখোড় বক্তৃতা। আমি ত গোর খুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ ব্যাটাই না কোত্থেকে উড়ে এসে ওদের বোঝাতে শুরু করলো ঃ—কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হারে মানুষ মরছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পারে। দেখুনতো কি সব বিদঘুটে কথা।

নেতা। ওকে সুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন ?

হাফিজ। কি যে বলেন স্যার। মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেরে ফয়দা কি ? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই গুড় গুড় করে আমার সঙ্গে চলে এলো। ওকে এই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালারাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনও নাকি খোঁড়াই শেষ হোলো না ! [ঘড়ি দেখিয়া] এতক্ষণে নিশ্চয়ই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা। [গ্লাসে চুমুক দিয়া] না। কাজটা ঠিক হয় নি। এ সব ফকির দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়। কোথেকে কি উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে।

হাফিজ। লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারতো না। রক্ত মাংসের স্তূপ। দেখে ও কি বুঝবে? এরকম লাশ তো ট্রেন-চাপা মড়ারও হতে পরে।

নেতা। গুলী চলেছে দুপুর বেলা। খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে, এফোঁড় ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক—শহরে থেকেও এ খবর ওর কানে পৌঁছেনি তা ভাবতে আমি রাজী নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকীর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ। মুর্দা ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ওত এক রকম কবরের বাসিন্দা। ভাষার দাবীতে মিছিল বেরিয়েছিল বলে পুলিশ গুলী করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে— এত কথা বোঝাবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ওর নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুঁজে দিতে চায়—কারণ ওর ধারণা, মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে—খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল।

নেতা। কিন্তু লাশগুলো ক কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তাত ও দেখেছে। সকাল বেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয়? লাশ নিয়ে মিছিল করতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে সকাল বেলা যদি ছাত্ররা এখানেও খোঁজ করতে আসে?

হাফিস। আপনারা লীডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি-অফিসার, হুকুম তামিল করেই খালাস। কি করতে হবে?

(স্তব্ধতা)

নেতা। ওটাকে শুদ্ধো পুঁতে দাও।

হাফিজ। এ্যা? কি বলছেন স্যার? আপনি এক্সাইটেড হয়ে গেছেন স্যার। আর খাবেন না এখন।

নেতা। আমার মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো-বিশ পঁচিশ হাত—যত নীচে পারো। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে, ভরাট করে গেঁথে ফেল। কোন দিন যেন আর ওপরে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পারে। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।

হাফিজ। আপনি বড় একসাইটেড স্যার! এ সব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার! এক্‌সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এ জন্য অন্য রকম। কোন সময়ই আমাদের উত্তেজিত হতে নেই। ভান করতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা। পুঁতে ফেল!

হাফিজ। ভুল, খুব ভুল হবে। যাই করতে হয় স্যার খুব কুল্‌লী করতে হবে। এসব আমাদের রীতিমত প্রাকটিস করে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেরী হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা। যান তাড়াতাড়ি যান। আপনার কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আর বেশীক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ। এ্যা। ওহ—হে হে হে! আপনার কথা শুনলে হাসি পায় ঠিক—কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড় ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন পড়ে যাবো। বড্‌ডো ভয় পেয়ে গেছি স্যার। আরেকটু দেবেন স্যার? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে কাজ করতে পারবো। এই নূতন বোতলটা কেমন স্যার?

নেতা। [চোখ তুলিয়া] আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই

দফায় একটু কমিয়ে দিলাম। [গ্লাসে কিছুটা ঢালিয়া বোতলটা তুলিয়া দিলেন।]

[নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ ময়লা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে শেষ করিয়াছে।]

ফকির। [হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া] ঝুটা। [হাফিজ ও নেতা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।]

নেতা। কে?

হাফিজ। এঁ্যা! ওহ্! আপনি? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর।

ফকির। ঝুঁটা, মিথ্যাবাদী। আমাকে চিনতে পারে না এ গোরস্থানে এমন কেউ নেই। জিন্দা মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দায় পার্থক্য বোঝো? দেখলে চিনতে পারবে?

হাফিজ। সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকির। ঝুঁটা! তুমি কোনো পার্থক্য বোঝো না, কিছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমার মতো জিন্দা আদমীকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না! তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দা নয়। মরেনি। মরবে না। ওরা কখনো কবরে যাবে না। কবরের নীচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠে চলে আসবে।

হাফিজ। আপনি তো এই দিকে ছিলেন! ওদিকে গেলেন কখন?

ফকির। বাবা! তোমরা শহরের অলি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্থান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নীচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরী করেছি। হো হা হা। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারবো কেন?

হাফিজ। হে হা হা। আপনি বড় মজার কথা বলেছেন হুজুর।

ফকির। এই ত ঠিক বুঝতে পেরেছ বাবা! তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না করিয়েই ওপার চালান করে দেবে! পরীক্ষা না করে কি আর আমি এমনি যেতে দি!

হাফিজ। সালাম হুজুর! আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পারিনি।

ফকির। সাবাস বেটা! তোর নজর খুলছে।

হাফিজ। তা হুজুর এখন অনুমতি দিন ওদের পার করে দি।

ফকির। না! আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাই না চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে এক্কেবারে তোদের ঢাকা মোটর গাড়ীর ভেতর গিয়ে উঠলাম!

নেতা। ইন্সপেক্টর!

ফকির। প্রথমে দেখে মনে হোলো ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি, কোনটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশ্‌ত নেই, কোনটার ফাটা খুলি দিয়ে কি সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কবরের কাবেল। কিছু নয়, শেয়াল শকুনে খামছে কামড়ে একটু খারাব করে গেছে। তারপর হঠাৎ খেয়াল করে দিখি—না'ত, ঠিকত নাই! উহুঁম!

হাফিজ। সে কি হুজুর! ঠিক। সব ত ঠিকই আছে।

ফকির। চোপরও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই। তোমরা চোরা-কারবারী। আমি শুঁকে দেখেছি গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ। গন্ধ?

ফকির। বাসি মরার গন্ধ আমি চিনি না? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষধের, গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ পঁচিশ ত্রিশ হাত, যত নীচেই মাটি চাপা দাও না কেন—এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ। ওহ্? তা'হলে বলুন কবর দেয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটির নীচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির। ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমায় ও বল না। আমিও তোমাদের কথা মানবো না। ও মুর্দা কবরের নয়। আমি ওদের ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ। খোদা হাফিজ।

[ফকির কিছু দূর যাইয়া আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চারিদিক হইতে কি শুঁকিতে চেষ্টা করে। নিজের শরীরেও শুঁকিয়া দেখে।]

ফকির। নাঃ আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি—[আগাইয়া আসিয়া একবার হাফিজের গা শুঁকিবে। তারপর ঝুঁকিয়া হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেয়। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয়। মুখচোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া] উহ্! তাই বলো! এইবার পেয়েছি। ব্যাটারা কি ভুলই না করেছে!

নেতা। ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকির। গন্ধ! তোমাদের গায়ে মরা মানুষের গন্ধ! তোমরা এখানে কি কোরছো? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদেরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরা বাইরে থেকে মজা লুটতে চাও, না? না না। আমার রাজ্যে এসব চলবে না। [গন্ধ শুঁকে] তোমাদের গায়ে মুখে পাই মরার গন্ধ! তোমাদের সময় হয়ে গেছে। ছিঃ এরকম ফাঁকি দেয় না! আমি ওদের তুলে নিয়ে আসছি, তোমরা তৈরী হয়ে নাও। ইস্! গোর খুঁড়েরা কি ভুলই না করেছে! না না এ'ত হতে পারে না—

[বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরের প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিৎ বেসামাল]

হাফিজ। হে হে হে হে স্যার! সব খতম স্যার। আমরা এখন ফ্রী! দেখলেন তো, পাগলটাকে কি রকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে অত হুজুব হুজুর না বললে হয়ত গাঁয়ের দিকেই ছুটত। আর শরীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এর ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা। ভালো হতো। তুলে নিয়ে আপনাকে শুদ্ধো পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতাম।

হাফিজ। ঐ একটা নোংরা কথা বারবার বলবেন না, স্যার। তা হলে আমিও আপনার সম্পর্কে দু'একটা হক্ কথা বলে ফেলবো কিন্তু।

নেতা। যেমন।

হাফিজ। যেমন? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মত ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দোবো।

নেতা। মারহাবা! সাবাস! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিক মত উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কি করে?

হাফিজ। অনেক দিন হোলো এ লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝবো না?

নেতা। সবটা ঠিক ধরতে পারেন নি। উঠতে হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিক দিতে পারব। কি, বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হাফিজ। বিশ্বাস? হ্যাঁ! পারবেন! তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটাও ঠিক আছে। যে কোনও পরিস্থিতিতে এখনও আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারবো। তবে, তবে

মানে এই চোখ, আর কান খামোকাই একটু বেশী কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা। ভয় ? ভয় কিসের ? তুমি মনে করেছো ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই ? এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়েই যাবো ! কোথাকার আমার জীন্দা পীর এসেছেন— ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে !

হাফিজ। কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে। মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়—কি করবেন তখন আপনি ?

নেতা। সব্বাইকে, আপনাকে শুদ্ধো, এক সঙ্গে পুঁতে ফেলতাম !

হাফিজ। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করি নি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি আসেও আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসবো। দেখবো। এগিয়ে যাবো। হাত মেলাবো। ভয় কিছুতেই পাবো না। [নিজের গলা তুই হাতে সজোরে টিপিয়া ধরিয়া] গ···লা টিপে ধরে রাখবো। যাতে বুকের মধ্যে ভ···য় কিছুতেই ঢুকতে না পারে। আরেকটু দেবেন স্যার ? বুকে সাহস আসবে। কেমন জানি ইয়ে করছে।

[ততক্ষণে পার্টিশানের ঐ পাশ হইতে সকলের অলক্ষ্যে ক্রমো-জ্জ্বলিত আলোক শিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমণ্ডল ও মস্তক পরিবেষ্টিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ। মূর্ত্তি নিশ্চল ; নেতা যখন শেষবারের মত ইন্সপেক্টরকে পানীয় দিবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন তখন ঐ স্তব্ধ মূর্ত্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কি যেন ছুঁড়িয়া মারিল। কাচের গ্লাসের ঝন্ ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চীৎকার।]

হাফিজ। গুলী! গুলী স্যার! শুয়ে পড়ুন শীগ্‌গীর! গুলী!

[দুইজনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিষ্পন্দ মুখ। কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা।]

নেতা। [চাপা স্বরে] গুলী যে বুঝলে কি করে?

হাফিজ। দেখেছি!

নেতা। কে ছুঁড়েছে তুমি দেখেছো?

হাফিজ। না। তবে কি ছুঁড়েছে দেখেছি।

নেতা। কোথায়?

হাফিজ। বেশী নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কি না? [উপুড় হইয়া একটু চারিদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কি তুলিয়া দেখে] ধরুন, পেয়েছি।

নেতা। [হাতে লইয়া] এ কি? এ যে বুলেট! রক্তমাখা!

হাফিজ। কুল্‌লী! কুল্‌লী! ভয় পাবেন না স্যার। ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড! ট্রাকের ভিতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়ত খুলে নিয়ে এসেছে। সে গুলোই ছুঁড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা। ও! তা'হলে বলো কিছু না! মুর্দা ফকির—সেত জ্যান্ত আদমী। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ। এখন উঠে পড়া যাক স্যার! মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কি!

নেতা। ইন্সপেক্টর।

হাফিজ। জী।

নেতা। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফিজ। এ্যাঁ!

নেতা। তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি।

হাফিজ। [ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থির কণ্ঠে] উঠে এসেছে।

নেতা। কে?

হাফিজ। সেই লাশটা।

নেতা। লাশ? কোন লাশটা?

হাফিজ। বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নেই!

নেতা। ওহ্! —কি চায়?

হাফিজ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব?

নেতা। কি জিজ্ঞেস করবে?

হাফিজ। এই, কি চায়, কেন উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি—এই সব?

নেতা। আমাদের কথা বুঝবে?

হাফিজ। ট্রাই করতে হবে। সব লাইনই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্‌লি অগ্রসর হ'তে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব হ'তে বাধ্য। কিন্তু অন্যরকম হলেও আমাদের ভয় পেলে চলবে না। ফেইস করতেই হবে। [উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্টে। নাটুকে মাতালের টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হইয়াছে তাহা স্পষ্ট!]

নেতা। আপনি কিচ্ছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাকা।

হাফিজ। খবরদার, অমন কাজও করবেন না। [ফিস্ ফিস্ করিয়া] পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার। বুঝতে পারছেন না—এটা—ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ্য করুন আমি কি রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেবো। [ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে। বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করতে চেষ্টা করে।] এই!—এই! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই! হেই। [মূর্তি নীরব। নিশ্চল] [ঘুরিয়া] স্যার, কোন সাড়া দিচ্ছে না যে?

নেতা। বোধ হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়ত কোন কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। আমরা চলো আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ। তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাবো? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না, স্যার।

মূর্ত্তি। আমি যাবো না। আমি থাকবো। [দু'জনে হতবাক! ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়]

হাফিজ। কোথায় যাবে না? কোথায় থাকবে?

মূর্ত্তি। কবরে যাবো না। এখানে থাকবো।

হাফিজ। অবুঝের মত কথা বোলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্ত্তি। মিথ্যে কথা। আমরা মরি নি। আমরা মরতে চাই নি। আমরা মরবো না।

হাফিজ। [নেতার কাছে আসিয়া] বড় একগুঁয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে, মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার? যদি কিছু আছর হয়! পারবেন না স্যার? আপনি তো বলেছিলেন—যাই হোক—বক্তৃতা দিতে আপনার কোন কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না!

নেতা। [ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া] দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরুব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এ দেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমরে বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে—

মূর্ত্তি। কবরে যাব না।

নেতা। আগে কথাটা ভাল করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাশে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্ত্তি। ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা। জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাও নি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমাব মত ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্ব্বনাশ না দেখে তুমি বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছো না। তোমাকে দেশের নামে, কওমেব নামে, দীনেব নামে, যারা এখনও মরেনি—তাদের নামে—মিনতি করছি—তুমি যাও, যাও, যাও।

মূর্ত্তি। আমি বাঁচবো।

নেতা। কি লাভ তোমার বেঁচে? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কি লাভ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মত কবরে চলে যাও। দেখবে দু'দিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। [মূর্ত্তি মাথা নাড়ে] আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবী অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেবো। তোমার নামে মনুমেণ্ট গড়ে দেবো। তোমার দাবী এ্যাসেম্বলীতে পাশ করিয়ে নেবো। দেশজোড়া তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করবো। যা বলবে তাই করবো। দোহাই তোমার তবু অমন স্তব্ধ

পাথরের মূর্ত্তির মত আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকোনা। সরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

[সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্ত্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্তরেখা।]

কে? তুমি কে?

মূর্ত্তি [২]। নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানী ছিলাম। তখন টের পাই নি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোকা কেটেকুটে গুলীটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে।

নেতা। তুমিও এই দলে এসে জুটেছো নাকি?

মূর্ত্তি [২]। গুলী দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আল্‌গা হতে পারবো না।

নেতা। তুমি আমাকে চেন?

মূর্ত্তি [২]। চশমাটা আর খুঁজে পাই নি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে আপনার গলা চিনি।

নেতা। আমার কথা শুনেছ? এই মাত্র যা বলছিলাম?

মূর্তি [২]। শুনেছি। আপনি মিথ্যেবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড় মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্ত্তি। আমরা কবরে যাবো না।

মূর্ত্তি [২]। আমরা বাঁচবো। [বিড়বিড় করিতে করিতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না।]

[নেতা মাথা নীচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্ ফিস্ করিয়া]

হাফিজ। হবে না। এই লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমার মাথায় একটা প্লান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু করে ফেলবো। একটু ভোল বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয় স্যার। আপনি চুপ করে বসে দেখুন। [হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাঁচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটার মত মাথার উপর তুলিয়া দিল।]

নেতা। ঢং ছাড়ো। মেয়েলোকের মত ঘোমটা দিয়েছ কেন?

হাফিজ। [ফিস্ ফিস্ করিয়া] চুপ। আমি এখন স্ত্রীলোক। ঐ ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছি, কিচ্ছু ধরতে পারবে না। [আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রী লোকের মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।] খোকা! খোকা!

মূর্ত্তি। [চঞ্চল। বেদনাহত।] কে? কে ডাকে?

হাফিজ। খোকা কোথায় গেলি তুই? খো—কা!

মূর্ত্তি। কে? মা? মা! তুই কোথায় মা! [শূন্যে হাতড়ায়]

হাফিজ। এই যে যাদু, আমি এইখানে।

মূর্ত্তি। তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছিলে না মা? তুমি বারণ করলে, তবু আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকলো। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও—সেই জন্যে তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ওরকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকে কি করে জানলে মা?

হাফিজ। মা হ'লে সব জানতে হয়। মা হ'লে জানতি, মার কষ্ট

কি! মার বুক খালি হ'লে, মার কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্ত্তি। তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে এল। আমার তখন খালি কি মনে হচ্ছিল জান মা? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছো। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম, তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে—ঠিক তেমনি। আর আমার নাক-মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে। ঝরছে।

হাফিজ। তবু তো কোন কথা শুনিস না। তোরা কেবল মার দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস! এ তোদের কি নতুন নেশা! এত মরণ-পাগল কেন তোরা?

মূর্ত্তি! মিছে কথা মা। আমরা কেউ মরতে চাই নি মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব পড়ব পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বার বার এসে বকবে—কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারীর ফাঁক দিয়ে ছায়া-মূর্ত্তির মত ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট্ট এলোমেলো শরীরটা দেখবো—দেখবো—মা, চলে যেও না—মা!_ তোমায় আমি দেখবো—তোমায় আমি আদর কোরবো মা- তুমি কোথায় মা?—মা!

হাফিজ। ঘুমের ঘোরে কি বকছিস? স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি? অনেক রাত হয়েছে। লক্ষ্মী বাবা, আর রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার শুতে যা।

মূর্ত্তি। আমাকে শুতে যেতে বলছো মা? না। না। আমি শোব

না। আমি আর কোনদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা—না, না আমি শোব না। আমি যাব না! আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

নেতা। ইন্সপেক্টর! তোমার এ ভূতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে?

হাফিজ। ছিঃ বাবা! জিদ কোরো না। লক্ষ্মীটি শুতে যাও। মার কথা শোনো।

[দ্বিতীয় মূর্ত্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়]

মূর্ত্তি [২]। [অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া] মিণ্টু। মিণ্টু। মিণ্টু ঘুমায়নি এখনও?

হাফিজ। [সুর পাল্‌টাইয়া] তোমার কোলে আসার জন্য কাঁদছে।

মূর্ত্তি [২]। দাও, আমার কোলে দাও। [বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে] ইস্! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো।

নেতা। খবরদার! ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। চলে যাও সব।

মূর্ত্তি। আমি যাবো না। আমি বাঁচবো মা। বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরো হাঁটবো মা। ঠাণ্ডা রূপোর মত পানি চিরে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটবো মা!

মূর্ত্তি [২]। কাঁদিসনে মিণ্টু। তোর বাপ কি কম চেষ্টা করেছে? দুষ্টু মুদী কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকী দিল না! বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন? তুই কাঁদিসনে মিণ্টু। তুই কাঁদলে তোর মাও কেবল কাঁদবে! এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে!

নেতা। সকাল পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি? না আমি তা পারব না। এতসব আবদার আমার সঙ্গে চলবে না। গেট আউট! ডেভিল্‌স্! যাও বলছি।

হাফিজ। উত্তেজিত হবেন না স্যার। কুল্‌লি। কুউল্‌লি!

মূর্ত্তি। তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিছু ভেব না মা। আমি কিছুতেই মরব না। ছায়া মূর্ত্তির মতো বার বার আসবো। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ো, দরজায় এসে টোকা দেবো। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোমায় ইশারা কোরবো। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বো মা।

মূর্ত্তি [২]। [কোলের কল্পিত সন্তানকে] দূর বোকা! তুই স্বপ্ন দেখছিস। ভয়ের কি আছে! তুই ত আমার কোলে! আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। [সামনের দিকে ইশারা করিয়া] ওগুলো কিছু না। সব সং সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা। ইন্সপেক্টর! আমি এসব মানিনা। আমি স···ব পুঁতে ফেলব। একটা একটা করে গুলী করে আমি সব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। হাজার হাজার হাত মাটির নীচে সব পুঁতে ফেলবো। যাতে কোন দিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলী, সব গুলোকে আবার গুলী করো। গার্ড! গার্ড! [হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির।]

ফকির। জী হুজুর।

নেতা। [লক্ষ্য না করিয়া] গুলী করো।

ফকির। গুলী? ওহ! হ্যাঁ! আছে! আমার কাছে আরো কয়েকটা আছে। এই নিন। বুলেট। খুব তাজা! টাটকা এখনও খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন।

[স্তম্ভিত ভয়ার্ত্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে]

লোড আপনি করুন। আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। আমি মিছিলটা এই দিকে ডেকে নিয়ে আসি।

[হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে

তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।]

[নেপথ্যে মুর্দ্দা ফকির চীৎকার করিতেছে : তোরা কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলী গুলী হবে! ফুর্ত্তি করে উঠে আয় সব! কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলী গুলী হবে আজ! কবর খালি করে সব উঠে আয়!]

[মঞ্চের উপরের লাল মূর্ত্তিদ্বয় মুর্দ্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন—ক্রমে আরও অনেকে—সারি দিয়া চলিয়া যাইবে। এবং তাহাদের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।]

[হাফিজ ও নেতা লক্ষ্য করে নাই যে মঞ্চ খালি হইয়া গিয়াছে]

নেতা। [বিবর্ণ মুখে] ইন্সপেক্টর! হার্টটা জানি কেমন করছে। বড় ভয় পেয়ে গেছি। একটু ধরে রেখো আমাকে। আর আর একটু ঢেলে দিতে পারবে?

হাফিজ। না আপনার এখনও হুঁশ নেই। আমার নিজেরও হয়ত নেই। ঠিক বুঝতে পারছি না।

[পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে।]

নেতা। [চমকাইয়া] কে? এটা কি আবার?

হাফিজ। [দেখিয়া] ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউণ্ড নাকি? বন্দুকের গুলীর মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি! কি চাও?

গার্ড। গাড়ীতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে। সব কাম খতম। কারফিউ শেষ হইতেও আর দেরী নেই।

হাফিজ। [প্রথম লক্ষ্য করিল যে মঞ্চ খালি। ভাল করিয়া কয়েকবার চোখ কচলায়] গুড! সব কাজ খতম ত? গুড! সব কাজ খতম স্যার? নীট জব। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার? ভাল করে দেখুন না নিজেই।

নেতা। [ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে] হুম!

গার্ড। কিছু তালাশ করতেছেন হুজুর! খুঁইজা দেখুম?

নেতা। না চলো।

হাফিজ। কিছু না স্যার। এসব কিছু না। গোরস্থানে এরকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবাব স্যার—মানে—

নেতা। হুম! চলো। আর ছাখো, মুর্দ্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক। [বুকে হাত চাপিয়া ধরে]

হাফিজ। এ্যাঁ? মুর্দ্দা ফকির? ওহ্ নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ইয়েজ স্যার।

[সকলে ধীবে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস-বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।]

যবনিকা

একুশের গল্প

মৌন নয়

শওকত ওস্‌মান
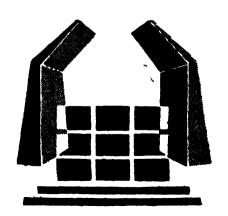
বাসে সমস্ত প্যাসেঞ্জার চুপচাপ বসে আছে।

কিছুক্ষণ আগে যেন অনেক কথা হয়ে গেছে। অনেক অনেক কথা। তারই তর্জ্জনী উঁচোনো উদ্ধত শাসনে সব চুপ। পার্শ্বস্থ দ্রুতচারী গাছপালা থেকে আগত নীড়-সন্ধানী পাখীদের মিষ্টি চীৎকার, শুধু ব্যতিক্রম। অনেক, অনেক কথা ছড়ানো রয়েছে জীর্ণ বাসের কাঠের ফ্রেমে। এখন তাই সবাই স্তব্ধ। বিরহী কান্নায় বুক হাল্কা করে দিয়ে চেয়ে আছে বিষণ্ণ দিগন্তের দিকে। আর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বাতাসের মর্ম্মর শুধু কাজ করে যাক অন্ধকারে গলে-পড়া পাতার ধমনীতে। পৃথিবী আর্তনাদ শুনুক। মানুষের মুখ বন্ধ থাক।

অস্পষ্ট আলো জ্বলছে বাসের ভিতরে।

কণ্ডাক্টার ফ্রেমের শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। প্যাসেঞ্জার ডাকা আজ তার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য নয়; হাট-হাজারী বায়েজিদ বোস্তান নতুনপাড়া তার মুখ থেকে খইয়ের মত ফুটে বেরোয় অন্যান্য দিন। আজ কণ্ডাক্টারের ছুটি অথবা কোন প্যাসেঞ্জার প্রয়োজন নেই।

বাসের ঝাঁকুনির সঙ্গে সামাল দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে পা-দানীর উপর। তারও দৃষ্টি অন্ধকারের দিকে বাসের জানালা ছাড়িয়ে। ওপাশে. আকাশের গায়ে সীতাকুণ্ড পাহাড়-শাখার স্তব্ধ টিলারা কুঁজো হয়ে হয়ে দৌড়ের বাজি ধরেছে বাসের সঙ্গে। পাশে কালো নিস্তরঙ্গ মেঘের পটভূমি।. যার বুক ফুঁড়ে কোন নিঃসঙ্গ খেজুর

কি অন্য কোন বুনো গাছ গোধূলি-হাওয়ায় দোল খাচ্ছে প্রবাহের সঙ্গ নিতে। কণ্ডাক্টারের চোখে ঝাপ্সা আকার-আয়তন শুধু আঁকা হয়, তার কোন বস্তুনাম থাকে না।

প্যাসেঞ্জার দশ-বারো জন। ড্রাইভারের পাশে একজন। তার মাথায় হ্যাট। কোন অফিসার হওয়া সম্ভব। ঐ মুখ দেখা যায় না অন্ধকারে। ড্রাইভারের সোজাসুজি গরাদের এপারে ঠিক মাঝখানে একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট। বাসের আলোয় তার মুখ স্পষ্ট। সাদা দাড়ি-ঘন চওড়া রেখায়িত মুখ, খাড়া নাক। ঈষৎ কোটর-গত চোখের দু-পাশেও রেখার ভিড়। মাঝে দীর্ঘ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় বৃদ্ধ এক-একবার চোখ খুলছে, তখন কোটরের গভীরতা উবে যায়— দীপ্তির আভাস স্বতঃই প্রকাশ পায়, নামাজ-কালীন তহরীমা বাঁধার মত বুকে দুই হাত বেঁধে সে আছে। অবনত মুখ। দুই গণ্ডদেশের মাঝামাঝি নাক, আলো-ছায়ার জাল বুনে রেখেছে। তাই এই মুখ মনে হয় আদিম পাহাড় চূড়ায় খোদাই কোন দরবেশের মূর্ত্তি। গায়ে পিরহান ঝুলে পড়েছে পা-তক। কাঁধে লাল গামছা। পায়ে সাধারণ চটি। বসে আছে সে মৌন। নিঃশ্বাস নিতে তার ফোকলা গালে আরো খাদ সৃষ্টি হয়। আলো-ছায়ার অগোছালো বিকীরণ কোন কঙ্কাল-মুখ সৃষ্টি করে—যার গর্ত্তে গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা যেন সাদা শন গুঁজে দিয়েছে জীবন্ত মানুষ তৈরীর লোভে।

সমস্ত প্যাসেঞ্জারের দৃষ্টি প্রায়ই এই বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ। অন্য সময় তারাও বাইরের দিকে চেয়ে থাকে।

বৃদ্ধের দুই পাশে দুইজন চাষী। সম্মুখে বাসের মেঝেয় এক-জোড়া বাঁশের বজ্‌রা পড়ে আছে। কোন জিনিস শহরে বিক্রি করতে গিয়েছিল, এখন ফিরে যাচ্ছে হাটের শেষে। এই দুই জনের পরনে লুঙ্গী। ঈষৎ শীতের আমেজ আছে বাতাসে, তাই গায়ে গামছা-লেপ্‌টানো। তারাও চুপ্‌চাপ। দুই জনে বৃদ্ধের দিকে

ঘন-ঘন তাকায়, তারপর মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে। আবার জানালার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বাম পাশের চাষী এক জন অনেকক্ষণ উস্‌খুস করছিল। তার গলায় অস্বোয়াস্তি। পাকা বিড়ি-খোর সে। কিন্তু বিড়ি ধরাতে সাহস পায় না। কোন পবিত্র আস্তানায় যেন সে বসে আছে, সম্মুখে পীর-পয়গম্বর—এখানে বিড়ি ধরানো বেয়াদবী। এমন ধৃষ্টতা তার মনুষ্যত্বের বাইরে। দেশালাই-বিড়ি বাম হাতে ধরে সে এমন জড় বনে গেছে, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বৃদ্ধের দিকে এক-একবার চায় আর মুখ নীচু করে সে।

ড্রাইভারের সোজাসুজি পাশবেঞ্চির উপর একজন তরুণ। হাতে বই দেখে নিঃসন্দেহে বলা যায় ছাত্র। গৌর-বর্ণ মুখে কৈশোরের ছাপ একদম নিঃশেষে মুছে যায় নি। তার কৃশ লম্বাটে মুখাবয়ব পাষাণের মত স্থির। চুপচাপ সে-ও। হাঁটুর উপর হাঁটু তুলে অনড় হয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে পায়ের অস্বোয়াস্তি কাটাতে যখন সে হাঁটু বদলায়, তার পায়জামার নীচে বাদামী জুতোর ঘষ্‌ঘষ্‌ আওয়াজ হয়। কিন্তু এত মৃদু যে, ষ্টিয়ারিং আর ইঞ্জিনের তোড়ে তা থ' পায় না। একটা বাংলা বই খুলে সে একঘেয়েমি ধ্বংসের চেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু চোখ আজ বইয়ের পাতায় শান্তি পায় না। সমতল ম'ঠ, নতুন অফিস কি কারখানা ঘরের আলো ছাড়িয়ে টিলার ঘন-কালো অন্ধকারই বোধহয় চোখের শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম স্থল। কিসের ঝাপটা যেন ঐ তরুণের মুখেও র‍্যাঁদা চালিয়ে এবড়ো-থেবড়ো অকর্ষিত-জমি-জাত রুক্ষতা লেপে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে, হাতের মুঠি শক্ত করে সে আজ মন-প্রবাহের উজানে গুন টানছে।

ছাত্রটির সোজাসুজি সম্মুখের বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট একজন কেরানী ভদ্রলোক। উত্তরমুখী বাসের যাত্রাপথ। সে পশ্চিমদিকে

মুখ ফিরিয়ে বসে আছে ঘাড় একটু কাৎ করে। কোন অস্বোয়াস্তি যেন নেই তার এমন আসনে। নিবিড় অন্ধকারেই বরং স্বোয়াস্তি জড়ো হয়েছে। উধাও-গতি বাসের সঙ্গে মনের সমতা রক্ষা অন্ধকার আঁকড়েই সম্ভব। একটু হাত-পাও নড়ে না তার। ভদ্রলোকের পাশে আরো কয়েকজন আছে। ছোট বালবের আলো ফিকে, সকলের মুখ দেখা যায় না। কিন্তু নিস্তব্ধতার ছোঁয়াচ তাদেরও বেহাই দেয়নি। ছাত্রের পাশে এমন আরো কয়েকজন। সবাই বোবা। কেউ কাশ্‌ছে না পর্য্যন্ত। মফস্বলের উচু-নীচু পথে বাসের সফর সুখ-দায়ক নয়, গল্প-গুজবে এই অসুবিধা কিছু কমে। কিন্তু আজ কারো কোন উৎসাহ নেই। একজন জানালার গরাদে মাথা চেপে ধরেছে জোরে। হয়ত মাথা ধরা, অথবা ক্ষোভে জ্বালার হাত-পা ছোঁড়ার অশোভনতা থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ এই পন্থা।

একটা লেভেল ক্রসিং পার হতে বাসের গতি ঝিমিয়ে এলো। রেললাইনের দু-পাশে খাদ, জোনাকি উড়ছে হাজার হাজার। খেজুর ঝোপ শনচুল বুড়ির মত বাতাসে উকুন খুঁজছে! ক্রসিং-এর পর একটু খাড়াই পথ। মোটরের ইঞ্জিন গীয়ার বদলের সাথে কঁকিয়ে উঠল। আবার পুরাতন স্পীড ঝেটিয়ে যাচ্ছে গাছ-পালার সারি, ম্লান, ডিপা-জ্বলা অনিয়মস্তব্ধ চা-খানা, গেরস্থর ঘরবাড়ী, অন্ধকার-লুপ্ত ফসল-শেষ নাড়া-বন। বর্ষা-ক্ষত পথের মধ্যস্থিত ছোট ফাটল পার হতে বাস বেশ ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। আরোহীরা জানালার রেলিং কি বেঞ্চি ধবে তাল সামলে নিল, কোন হৈ-চৈ করল না কেউ—অথচ আনন্দের এমন সুযোগ মফস্বলে কে কবে অবহেলা করে? পথের ক্লান্তি হৈ-চৈ দিয়ে ঠাণ্ডা হয়, কে না জানে! আবার সমান পীচ পথ। বাসের গতি সমান। একটু এগিয়ে যেতে এক পাশে ঝুলে পড়া মিঞ্জিরি গাছ বাসের গায়ে ডানা ঝটপট করে গেল। আজ কারো হুঁশ নেই। ড্রাইভারকে হুঁশিয়ারি ছাড়ছে না কেউ আগে থেকে। চোখে ডালপালা লাগতে পারে, এমন

আশঙ্কাও নেই। হয়ত আজ কারো চোখ নিজের দিকে নেই। আর কোথাও—কোন রক্তাক্ত রাজপথে, কি কোন শোক-বিধুর গৃহ-প্রাঙ্গণে নির্বাকে থেমে আছে। সমস্ত বাংলা দেশের গাছ-পালা নদী-নালা খাল-বিল ছায়াপথ বন-জঙ্গল পার হয়ে, দূরত্বের ব্যবধান উপেক্ষা করে, বর্বরতার সম্মুখে স্তব্ধ মিছিলের লক্ষ চোখের দৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেছে—আজ একক চোখে তাই মনে হয় দৃষ্টি নেই। তাই ত পুরাতন অভ্যাস ভুলে গেছে যাত্রীরা। ড্রাইভারের বাম হাতে একটা হলুদ-পাতা ডালের হোঁচট লাগল, সে আত্ম-রক্ষায় হাত বাড়াল না থামল না—যেমন থামল না ঐ তরু শাখা। স্পীড আরো বেড়ে গেল। পাতায় আলিঙ্গন-বদ্ধ অন্ধকারের খিড়কী তুলে নক্ষত্ররা তাকায়। আবার বোবা মাঠের বিস্তার, উপরে খোলা আকাশ, তখন তারারা অনির্বাণ জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত দেখায়। মৌন পূর্ব-বঙ্গ যেন ঐখানে জ্বলে জ্বলে জিজ্ঞাসা করছে: আমার শস্য-শ্যামলা হরিৎ প্রান্তর, তোমাদের এই অন্নাতুর কান্না কেন? তোমাদের ভাষা কোথায়? তোমরা স্তব্ধ কেন?

কেউ জবাব দেয় না! বাসের অভ্যন্তরে সবাই মূক। খটখট ইঞ্জিনের রব শুধু ফুসে উঠছে, তারও জবাব দেওয়ার কোন ভাষা জানা নেই।

লোকালয় পাব হয়ে এলো স্ত্র-শকট, এবার দু'পাশে বে-বহা মাঠ। একদিকে পাহাড়ের শিরদাঁড়া থমথমে অন্ধকারে ঝাপসা। সমতল জমির উপর গাছপালার ছোপ আঁধারের বিচিত্র স্তরবিন্যাস সৃষ্টি করেছে। পাড় ভাঙা শুক্‌নো দীঘি, ঝাউয়ের পাহারা-ঘেরা পল্লী-পথের আত্মগোপনের ফাঁদ হেড-লাইটের সম্মুখে ভেঙে যায়। আবার একাকার সব। টায়ারের নীচে মচ্‌মচ্‌শব্দ শুধু জানান্ দেয়, এখানে বসন্তের হাওয়ায় অনেক পাতা ঝরছে, পাতায় পুরু এই পথ। কাঠের ব্রীজে চাকা ওঠার সময় ঢোলের মত ডুগডুগ শব্দ হয়। এমন গতির মুখে ঝাউমর্ম্মর বন-কলভাষ কোন দাগ কাটতে

পারে না কানে। বাস চলছে চলছে। পৃথিবীতে এক-মুহূর্তিক সত্য মাত্র জীবিত।

ছাত্রটির পাশে উপবিষ্ট কয়েকজনের মধ্যে একটি লোক বিড়ি বের করল। হাতে দেশালাই। অতি সন্তর্পিত—যেন তার কাজ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বিড়ি ধরাবে ভাবছে সে। একটা দেশলাইয়ের কাঠিও সে বের করল খোল থেকে। সম্মুখের বেঞ্চি থেকে একজন হাত ইশারায় বৃদ্ধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর মাথা নাড়ে। বিড়ি ধরিয়ো না—তোমার লজ্জা করে না? এমনই ভাব-খানা। নেশাখোরের আর নেশা করা হলো না। শার্টের পকেটে দেশালাই ঢুকল, বিড়ি ঢুকল, দেশলাইয়ের কাঠি একাকী—ঢুকল। সন্তর্পণে ঐ ব্যক্তি আবার যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখে, কেউ তাকিয়ে নেই ত? শান্ত মুখে ভদ্রলোক অন্ধকারে নিজের দৃষ্টি ডুবিয়ে দিল। দুষ্কৃতি নিবারণকারী এতক্ষণ সহযাত্রীর দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন তারও চোখ জানালার বাইরে।

গোটা দুই বাঁক ফিরতে বাসের স্পীড সামান্য কমল। রাত্রির প্রহর শুধু কমে না। কমে না বাসের ভিতর স্তব্ধতার শাসন।

মাঠের সফর শেষ হয়ে গেল। আবার লোকালয় শুরু হয়েছে। দুপাশে ঝিমমারা ঘর-বাড়ী, দহলিজ, কলা-বাঁশের বন। হেড-লাইটের আলো তীক্ষ্ণ-ধার এই সড়কে। একদম শীত যায় নি। ফিকে কুয়াশা গাছপালায়। অন্যান্য দিন পার্শ্ববর্তী দোকানে কলরব ওঠে। আজ লোক বসে আছে, কিন্তু গলা-ফাটা চঞ্চলতা নেই।

এই লোকালয়ের পর ছোট মাঠ শেষে, বাসের একজন যাত্রী উসখুস করে কণ্ডাক্টারের দিকে তাকায়। কিন্তু কোন কথা বলে না। হাবে-ভাবে মনে হয়, তার গন্তব্যস্থান নিকটে। কণ্ডাক্টারের চোখে পড়ল একবার। সে একটু উঠে এলে ড্রাইভারের সোজাসুজি। তারপর গরাদের ভেতর হাত গলিয়ে চালকের হাতে একটু টিপ দিল। আর কোন কথা হয় না। বোবার রাজ্যে ঠোঁট থাকা বৃথা।

পল্লী-পথের মুখ বড় সড়কে এসে মিশেছে। দু-পাশে দুটো মোটা কদম গাছ। আঁকা-বাঁকা ধূলি-ধূসর পথের সর্পিলতা ওই দিকে অন্ধকারে উধাও। ঐ ভদ্রলোক ধীরে ধীরে নেমে গেল। বার বার তার চোখ ঐ মৌন বৃদ্ধের উপর নিবদ্ধ হয়। শেষবারের মত সে দেখে নিল বাসের দরজা থেকে। কণ্ডাক্টার ভাড়া নিয়ে গলায় ঝোলানো ব্যাগে রেখে দিল। আলোর কাছে হাতের তালু চওড়া করে খুচরা পয়সা গোণা আজ নিষ্প্রয়োজন। প্যাসেঞ্জার ঠকিয়ে যেতে পারে? কিন্তু আরো বিরাট ক্ষতির দাগা খেয়েছে সে, তাই এই লোকসান তুচ্ছ। কণ্ডাক্টারের স্বতঃই মনে হয়, আজ তাকে প্রতারিত করে যাওয়ার মত এত শঠ এই এলাকায় নেই।

আবার ধাবমান পথ, চাকা, গ্রাম-গ্রামান্তর।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একবার চোখ তুলে চাইল। কিন্তু চোখ তখনই বুঁজে যায়। বুঁদ হয়ে আছে সে চিন্তার কড়া ঝাঁঝে। কিন্তু তারপরই সমস্ত বাস-যাত্রীদের মধ্যে স্তব্ধতা বেড়ে গেল। ছাত্রটি কি যেন বলতে গিয়ে থামল। বৃদ্ধের বদ্ধ মুঠি আরো শক্ত হয়ে উঠল। পার্শ্ববর্তী চাষী মাথা নাড়ল নিজের খেয়ালে—কোন আত্ম-কথোপ-কথনের বুদ্বুদের আঘাতে হয়ত। কেরানী ভদ্রলোকের মুখাবয়ব ঋজু কাঠিন্যে নিথর হয়ে এলো। অন্যান্য যাত্রীদের দৃষ্টি তখন বাসের অভ্যন্তরে। কণ্ডাক্টার বাসের দরজায় দাঁড়িয়েছিল, সেও নিঃশব্দে উঠে এলো।

শুধু মোটর বাস নিজের চলা-পথে নির্বিকার। তার অন্ত-আলোড়ন খট্ খট্ রবে, দু-পাশের ফেলে আসা প্রকৃতির সমারোহে শব্দায়িত।

আবার মৌনতার প্লাবন।

পাড়া-গাঁ এখনও নিশুতি হয়ে যায় নি। পিদিম জ্বলছে উঠানে, ইটের পাঁজা তুলছে পাঁজারীরা খোলা মাঠে। কিন্তু এই সজীবতা

বাস যাত্রীদের ছুঁতে পারে না। এখানে মড়ার রাজ্য। কঙ্কালের মত সবাই বসে আছে। এত মানুষের নিঃশ্বাসও যেন মাথা তুলতে পারছে না নীরবতার বুকে। চাষীর হাত থেকে দেশালাই খসে পড়ল খড়খড় শব্দে। কিন্তু তা তুলতে গিয়ে নীরবতর পবিত্রতা হানি, তার মনুষ্যত্বে বাঁধে। চাষীটার কণ্ঠনালীর উপরে একটু দোলা লাগল। হয়ত চোয়াল আরো শক্ত করতে বা মুখের 'আব' ঘুচাতে।

আরো দু-মাইল পরে বাসের গন্তব্যস্থান। নির্বিকার যাত্রীদল বসে আছে। কারো কোন উদ্বেগ নেই, তাড়াহুড়া নেই বাড়ী ফেরার। বৃদ্ধের দুই হাত বুকে বাঁধা। সেও গন্তব্য-পথের হদিস জানে না। কিন্তু তার নিঃশ্বাস যেন দ্রুততর হচ্ছে। কয়েকজন যাত্রীর দৃষ্টি আবার বাইরে থেকে ঐ মুখের উপর পড়ে।

বৃদ্ধের নিঃশ্বাস আরো দ্রুত, আরো ঘন। যেন ডুবে যাচ্ছে সে। কুঁচকে ঢলে পড়ল, পা একটু সটান, প্রসারিত হোল তার।

হঠাৎ হাঁপ ছাড়তে গিয়ে বৃদ্ধের কণ্ঠনালী আর স্থির থাকে না। শক্ত কফ জমেছে যেন গলার দু'পাশে। ফোকলা গাল বার-বার ওঠানামা করে। ঠোঁট কেঁপে উঠল। অসহ্য কি যেন বুক থেকে ঠেলে-ঠেলে উপরে উঠছে।

চোখের দৃষ্টি অপলক, বৃদ্ধ এইবার ডুকরে আর্তনাদ করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল নীরবতার জগদ্দল।

—"কি দোষ করেছিল আমার ছেলে? ওরা কেন তাকে গুলী করে মারল? কি দোষ—কি দোষ করেছিল সে? উঃ—"

কি দোষ করেছিল সে? এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন ভাসছে তার চোখের উপর। এখন-ই মুখ থুবড়ে পড়বে বৃদ্ধ বাসের মেঝেয়।

সমস্ত যাত্রী তখন নিজের জায়গা ছেড়ে বৃদ্ধের উপর ঝুঁকে পড়েছে। চাষী দুজন তার কোমর জড়িয়ে ধরল যেন পড়ে না যায়।

ড্রাইভারের এক হাতে ষ্টীয়ারিং, অন্য হাত সে সবার আগেই বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়েছে।

জোড়া-জোড়া জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি-স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে। দমকে দমকে সিংহ-গর্জন এখনই ফেটে পড়বে। সকলের গলার রগ কেঁপে কেঁপে উঠছে দমকে-দমকে।

নির্বিকার গাড়ী শুধু এগোতে লাগল।

হাসি

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্

এক

দিগন্ত রেখার একটু উপরে এখন লাল সূর্য্য। পরিপূর্ণ, বৃত্তাকার নীহার খালার ঘুম ভাঙ্গে।

পূবের খোলা জানালা দিয়ে সকাল বেলার কাঁচা রোদ অবাধে গড়িয়ে পড়ছে ঘরের মেঝেতে। বাইরে এখন নির্মল আকাশ, ঝকঝকে আলো। ঘুম ভাঙ্গতেই মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। চারিদিকে রোদ উঠে গ্যাছে কতো আগে। ঘুরে ফিরে মনটা কেবলি খুঁত খুঁত করতে থাকে। সূর্য্য ওঠার আগে শয্যা-ত্যাগ করা তার নিয়মিত অভ্যাস। ব্যতিক্রমটা তার মনকে পীড়া দেয়—কোন অবস্থাতেই তিনি ব্যতিক্রমকে মনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন না।

হাত মুখ ধুয়ে ফিডিং বোতলে গরম দুধ ভরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নীহার খালা ঘরে আসেন। দু'বৎসরের ছেলে মণ্টু! হাঁটতে শিখেছে অবধি ভোর বেলা তার কাজেরও অন্ত নেই। মায়ের অজান্তেই সে এক সময় বিছানা ছেড়ে উঠে যায়। ঘুমন্ত কাকের ডানা ঝটপটানো শুরু হয় তার অনেক পরে। আবছা অন্ধকারে মণ্টু এঘরে ঘুর ঘুর করে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে। কখনো ব্যস্ত, কখনো ধীর মন্থর। বড় আপার টেবিলে যেয়ে গোটা একখানা বই অথবা খাতাপত্র ছিঁড়ে ছেঁড়া কাগজের স্তূপ বানায়। এই দিয়েই আজকাল সে দিন আরম্ভের একটা নিয়ম দাঁড় করিয়েছে, মণ্টুর বিরুদ্ধে শেফালির ক্রমাগত নালিশ থেকে অন্ততঃ তাই মনে হয়।

নীহার খালা ডাকেন,

: মণ্ট—উ

: উঃ!

মিষ্টি গলায় সাড়া আসে পাশের কোনো ঘর থেকে।

: কোথায় তুমি?

দক্ষিণের ঘরটার দরজা দিয়ে আবির্ভূত হয় মণ্টু।

: কি মা মণি?

: কি আবার? এখন তুমি দুধ খাবে মা মণি।

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে অকারণে মাথা ঝাঁকায় মণ্টু। পায়ের গোড়ালি দিয়ে মেঝে ঠোকে। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ে। ছোট্ট হাত নাড়িয়ে অসম্মতি জানায়। মুখেও বলে,

: না মা! না মা!!

: হ্যাঁ মা! হ্যাঁ মা!!

নীহার খালা মণ্টুকে টেনে আনেন। বিছানায় শুইয়ে ফিডিং বোতলটা মুখে পুরে দেন। গোয়ার্তুমি থামিয়ে শান্ত সুবোধ লক্ষ্মী ছেলেটির মতো মণ্টুও চুপচাপ রবারের বাটটা মুখে পুরে চুক চুক শব্দ তুলে দুধ টানতে থাকে। অবশ্যি পায়ের মৃদু নাড়াচাড়ার বিরাম পড়ে না।

: তুমি ধরে ধরে খাও। হ্যাঁ? তুমি কতো লক্ষ্মী। তারপরে চলো বেড়াতে যাবো।

মণ্টুকে বিছানায় রেখে নীহার খালা পশ্চিম দিককার ঘরটাতে উঁকি দিতে গিয়ে দেখেন ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। মনে কেমন খটকা লাগে। কোনো প্রকার শব্দ না করে নীহার খালা সাবধানী পায়ে টিপে টিপে ঘরে ঢোকেন। ঘরের অবস্থা দেখে স্তব্ধ হয়ে যান। সারারাত এখানে এত কিছু হয়েছে। পাশের ঘরে থেকে এর বিন্দুবিসর্গও তিনি জানেন না! লাল, নীল, কালো, সবুজ, বেগুনী, হলুদ কালির মেঝেময় ছড়াছড়িটা দেখবার মতো। তক্ত পোষের

নীচে, এখানে সেখানে স্তূপ করা খবরের কাগজ: কালি লেপা। নীহার খালার কৌতূহল আর কিছুতেই বাগ মানে না। একটা স্তূপের পাশে তিনি বসে পড়েন। একটার পর একটা কাগজ উল্টাতে থাকেন।

: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। বাংলাভাষা জিন্দাবাদ !!

: ভাষার উপর হামলা চলবে না! ফ্যাসিস্ত নাজিম নিপাত যাও॥

: ২১শে ফেব্রুয়ারীর ডাক: সাড়া দিন।

: আজকের হরতালকে সাফল্যমণ্ডিত করুন!

: নাজিম চক্রান্তকে ব্যর্থ করুন! সরকারী হামলাকে রুখে দাঁড়ান॥

: সভা-শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করুন!

: বাংলাভাষা জিন্দাবাদ।

আরেকটা কাগজ টেনে নেন নীহার খালা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে।

: উর্দু-বাংলা ভাই ভাই!

: নাজিম-নুরুল চুক্তি রাখ অথবা গদী ছাড়॥

পোষ্টার পড়তে পড়তে নীহার খালা নিজেও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। দু'কানের ভেতরটা তার ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, মনে হয় শিরায় শিরায় রক্ত যেন টগবগ করে ফুটছে। মাঝে মাঝে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তার স্নেহশীতল ছায়াময় চোখ বিস্ফারিত হয়। ত্বরিৎ ক্ষিপ্রতায় আরেক বাণ্ডিল খুলে ফেলেন। হঠাৎ চোখ ঝলসে দেয় লেখাগুলো।

: ভাষা সমস্যা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। কশাইয়ের ছুরি থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচাবোই॥

: মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না!

: অন্যতম রাষ্ট্রভাষা চাই, বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ॥

পোষ্টার পড়া শেষ হয় নীহার খালার। লঘু পায়ে সরে এসে তিনি আবুর শিয়রে দাঁড়ান। উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত চোখজোড়া তার জ্বলতে থাকে রাত্রিশেষের দপদপে দুটি তারার মতো। অভিভূত অবস্থায় একদৃষ্টে তিনি চেয়ে থাকেন আবুর মুখের দিকে। ঘুমন্ত মুখটাকে বড়ো ক্লান্ত মনে হয় তার কাছে। ঘুমেও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুছে যায় নি, সারারাত্রির অনিদ্রাজনিত অতৃপ্তি মেঝেময় কালির গাঢ় দাগের মতো ছোপ ছোপ লেগে রয়েছে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অতৃপ্তি, অশান্তি : সারা মুখে তারি গভীর চিহ্ন। মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য নির্মম আঁচড়ে মুখের বিষণ্ণতাকে আরো ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। এর ভিতর থেকে আবুকে তার কাছে আরো বেশি পরিচিত বলে মনে হয় : তার উগ্র ব্যক্তিত্ববোধ আর একটা গভীর আত্মপ্রত্যয় ঘুমন্ত মুখের অভিব্যক্তিতে, শানানো নাকে, কপালে আর ভূরুর একটানা বিষণ্ণ পটভূমিতে খাপখোলা রৌদ্রের তরবারীর মতো তীব্র জ্যোতিঃ ঠিকরোচ্ছে। মুখে এক আশ্চর্য দৃঢ়তা ; অনমনীয়।

একতাল ঠাণ্ডা পাথরের স্তব্ধতা বুকে পুরে নীহার খালা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। মৃদু দুপ্ দুপ্ আওয়াজ তুলে বুকের ভিতরে জোড়া হৃদপিণ্ডটা নড়ছে। হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরয় না। বুনো ভ্যাপসা অন্ধকারে পথ হারিয়ে যাওয়া হাওয়ার আবেগে একরাশ অচেনা ব্যথা বুকের ভিতর কেমন উচ্ছৃংখল হয়ে ওঠে, উদ্দাম আবেগে হৃদয় মন আলোড়িত হতে থাকে।

রাত্রেও আবুর এতো কাজ!

দুরন্ত ছেলে। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে কোনো সময় যখন এসে হাজির হয় চেহারার দিকে তখন তাকানো যায় না।

রাস্তায় রোদ, বাতাস আর ধুলি, নির্দয় চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করে ওকে ঘরে পাঠিয়ে দেয়। তখন তার চেহারাটা হয় ঝোড়ো কাকের

মতো। মাস্তুল ভাঙ্গা, পাল ছেঁড়া, তলা ফুটো জাহাজের জীর্ণতার মতো করুণ।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নীহার খালা আবুর মাথার কাছে বসে পড়েন। ফিডিং বোতল রেখে মণ্টু এসে হাজির হয়। মাকে দেখেই নিঃশব্দ হাসিতে তার মুখ ভরে যায়, চোখের তারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নীহার খালা তাড়াতাড়ি দুই ঠোঁটের মাঝখানে তর্জনী স্থাপন করেন, চোখের মণি উপরের দিকে ঠেলে দেন। মণ্টু এতোদিন মায়ের ব্যবহৃত এই বিশেষ সঙ্কেতটা বুঝে ফেলবার মত বুদ্ধি আয়ত্ত করেছে। কথা বলতে মানা! মণ্টু হতভম্ব হয়ে যায়।

দুধটা তো সে খেয়েই এসেছে। তবু মায়ের এই অনাত্মীয় ব্যবহার। আশ্চর্য্য হবার মতো বৈকি!

কালি লেপটানো কাগজ, রঙের ডিবা, ব্রাশ, তুলি ঘরময় নানান রঙের ছড়াছড়ি দেখে মায়ের তর্জনী স্থাপনের ইঙ্গিতময়তাকে সে এক মুহূর্তে দিব্যি ভুলে বসে। হাততালি দিয়ে সে লাফিয়ে ওঠে,

ঃ বা! বা!!

নীহার খালা আবার আঙ্গুল রাখেন ঠোঁটের মাঝখানে, বড় করেন চোখের মণি।

কথা বলতে মানা। গোলমাল করতে মানা। ব্যাপারটা গোলমেলে দেখে নির্লিপ্ত ভালো মানুষটির মতো অগত্যা মণ্টু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। এসবে তার পোষাবে না।

চুলে আঙ্গুল ছোঁয় কি না ছোঁয় এমনিভাবে আবুর মাথায় হাত বুলোতে থাকেন নীহার খালা। অতি সাবধানে আস্তে আস্তে যেন আবুর ঘুম ভেঙ্গে না যায়। মাথা ভরতি ওর ঝাঁকড়া চুল, ধূ ধূ মাঠের দুপুরে একটা নির্জন আঁশ-শেওড়া গাছের মতো কেমন যেন রহস্যঘেরা। চুলগুলি পাকা কাশ ফুলের মতো নরম, মসৃণ,

তৃপ্তিদায়ক। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অসম্ভব তৃপ্তির একটা ভরা পূর্ণিমা যেন তার বুকের ভিতর উথলে উঠল। বাঁধ না মানা জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভরে দিয়ে গেলো! তার কল্পনা করতে ভালো লাগলো এমন একটা দৃশ্য: দূরের কোন দেশ যেখানে বৃষ্টি নেমেছিলো মায়ের স্নেহের মতো অকৃপণ ধারায়। এখানে একটা নির্জন অপরাহ্ন। দূরের সেই বৃষ্টি ধোয়া দেশ থেকে অজস্র প্রবাহে নেমে আসছে ঠাণ্ডা হাল্কা হাওয়া, ফুলে ফুলে উঠছে নির্জন সন্ধ্যাটি। একটু একটু করে এগিয়ে আসছে এমনি একটি নিটোল মূহূর্ত যখন তিনি হাওয়ার হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছেন আবুর চুলগুলো।

মুখ বিকৃত করে আবু ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে। নীহার খালার কল্পনায় বাধা পড়ে। সশব্দে একটা ঢোক গিলে আবু পাশ বদলায়। শব্দটা গিয়ে নীহাব খালার কলজেয় আঘাত করে। বাধা পেয়ে কল্পনার যে রেশটুকু মনের ভিতরে ছায়ার মতো অবশিষ্ট ছিলো তা-ও মিলিয়ে যায়। ব্যথায় বুকটা হঠাৎ চড় চড় করে ওঠে— চিড় ধরে ভিতরে কোথাও। আবুব মুখের দিকে তাকাতেই দুচোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে পানিতে। এত কষ্ট আবুর!

নীহার খালা দুহাতে মুখ ঢাকেন। বোবা কান্না ফেনিয়ে ওঠে। তার অগোচরে, চোখের আড়ালে আবুর এতো কাজ।

সারাদিন সে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। মিটিং করে এখানে সেখানে। মিটিংয়ে কথা শোনে। মিটিংয়ে বক্তৃতা দেয়। সেখানে তিনি তার নাগাল পান না। রাত্রেও তার কাজ শেষ হয় না। পোড়া দেশ, মানুষকে পাগল বানিয়ে পথে বিপথে ঘুরিয়ে মারার মতো কত কিছুই আছে চারিদিকে।

বহু রাত্রেই আবু ঘুমোয় না, এটা তার নজর এড়ায় নি। তা জেনেও তিনি নিরুপায়, ওর দুর্বোধ্য জেদের কাছে তাকে হার মানতেই হয়। যেদিন সে টের পায় যে নৈশ বিশ্রামের জন্য নীহার

খালার পীড়াপীড়িটা বিরক্তিকর হয়ে উঠবে সেদিন সে কৌশলের আশ্রয় নেয়। গল্প করতে করতে খালাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে সে আস্তে নিজের ঘরে চলে আসে। দরোজায় খিল এঁটে ইচ্ছামতো কাজ করে।

আবু কিছু না করে ভালো ছেলের মতো হাত পা গুটিয়ে নির্বিকার থাকুক তা তিনি চান না। তাহলে আবুকে আবু বলেই বলেই চেনা যাবে না। ব্যস্ততা উচ্ছৃঙ্খলতা, অবাধ্যতাই তার চরিত্র, সেখানেই তিনি তাকে দেখতে চান। তবে তারও একটা সীমা থাকা উচিত, এটুকুই শুধু তার প্রার্থনা। আবুর সব কিছুতে একটা সীমাই যদি না থাকলো তবে নীহার খালা আছে কি করতে!

ইচ্ছা করলে আবু নীহার খালার কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য ও নিতে পারে। তাতো সে করবেই না বরং উল্টো আশ্চর্য নিষ্ঠুরতায় তার সহৃদয় ইচ্ছাকে এড়িয়ে একা একা তার কাজের অকাজের পাহাড়ে পথ হাতড়ে মরবে!

এ্যালার্ম ঘড়িটায় একটানা শব্দ বাজতে থাকে। পুরানো ঘড়ি। মনে হয় শব্দটা কোথায় যেন থরথরে পাঁজরের ভিতর থেকে উঠছে। তীক্ষ্ণ মুখে অগুণতি লোহার পা-অলা কোন সরীসৃপ দ্রুতবেগে টিনের চালে চলাফেরা করলে যেমন শব্দ হয় ঘড়ির শব্দটাও তেমনি বীভৎস, ভয়াবহ লাগে নীহার খালার কানে। বুকটা কেমন ধড়াস করে ওঠে। নীহার খালা চমকে উঠে তাকিয়ে ছ্যাখেন সকাল সাড়ে আটটা।

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে আবু। চোখ দুটো নিষ্প্রভ জবা-ফুলের মতো। ঘোলাটে লাল। চোখের স্নায়ুতে অসমাপ্ত নিদ্রার আক্রমণ, তাই ভালো করে তাকাতে পারে না। দুহাতে সে চোখ কচলায় আর এই ফাঁকে আবুর অলক্ষ্যে নীহার খালা নিজের ভেজা

চোখ মুছে যেন আঁচলের প্রান্ত দিয়ে। কেননা কারো কান্না আবু সহ্য করতেই পারে না, ক্রন্দননিরত যদি আপনার অতি পরিচিত কেউ হয় তাহলে সে একেবারে ক্ষেপেই যায়। অপরিচিত কাকেও কাঁদতে দেখলে ওর মনটা ভারী হয়ে যায়। মুখটা হয় থমথমে। সারাদিন সে খারাপ ব্যবহার করে মানুষের সাথে। খেতে পারে না, ঘুমোয় না। সব সময় ছটফট করে, নিরিবিলি কাঁদেও। এসব কথা নীহার খালার অজানা নয়।

তাই, তাড়াতাড়ি তিনি যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেন। মুখে ফুটিয়ে তোলেন এক টুকরো হাসি। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মনের বিপন্ন দশাটা হাসির আড়ালে ঢাকা পড়ে না। সেজন্য মনে মনে শঙ্কিত হন খানিকটা। আবু চোখ মেলেই ছাখে সামনে দাঁড়িয়ে নীহার খালা। সে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে।

ঃ আরে খালা! তুমি?

কলকণ্ঠ আবু আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। ত্রস্ত পায়ে সে উঠে আসে নীহার খালার কাছাকাছি। তার উচ্ছাসটা হঠাৎ দপ করে নিবে যায়। মুখ ফুটে ওঠে কঠিন ব্যঞ্জনা। কপালের যে মোটা রগটা এমনিতেই দপদপ করছিলো সেটা ফুলে ওঠে। আবু ফুঁসে ওঠে অনেকটা!

ঃ খালা!

ঃ কি রে!

হেসে জিজ্ঞাসা করেন নীহার খালা। যা আংশকা করেছিলেন ঠিক তাই। আবু বল্লে,

ঃ কি আবার! আজকাল দেখছি হাসতেও পারো না। কিছু দিন থেকেই দেখছি! জানোই তো আমার জন্য তোমার কোন অসুবিধে হোক তা আমি চাইনে। শুধু বল্লেই পারো। এমন কান্নার মতো হাসার দরকার কি?

আবু উত্তেজিত হয়ে পড়ে আর কেন যে সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে

তা তিনি জানেন। কোনো ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা ও সহ্য করতে পারে না। তাই কাউকে হাসার মতো করে কাঁদতে দেখলে কিংবা কাঁদার মতো হাসতে দেখলে ও ক্ষেপে যায়। এতগুলো কথার সামনে নীহার খালা হকচকিয়ে যান। কোনো রকমে অস্বস্তি কাটিয়ে বলে ওঠেন,

ঃ পাগল! কান্নার মত হাসা অথবা হাসার মত কান্না, কেমন যেন কবিতা হয়ে গেল না? আমি তো পারিই নে! তুই হেসে শিখিয়ে দেনা।

ঃ দাঁড়াও। এখানে বসে থাকো! আমি মুখ ধুয়ে আসি। খবরদার যেয়ো না যেন।

ঃ নড়লে বুঝি ঠ্যাঙ্গাবি?

ঃ হ্যাঁ, তাই।

গম্ভীরভাবে কথা কটি বলেই আবু বেরিয়ে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে ভিতরে আসে মন্টুকে কোলে নিয়ে। মন্টুকে কোলে নিয়ে মুহূর্তেই সে বদলে গ্যাছে, একটু আগের ক্ষোভ কিংবা গাম্ভীর্য্য কোন কিছুর চিহ্নই আর মুখে নেই। দুই ভাইয়ে মেতে উঠেছে। নীহার খালা স্বস্তি অনুভব করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,

ঃ আবু। তোর বুঝি রাতদিন অনেক কাজ?

নীহার খালার কথা ভারী হয়ে আসে।

মন্টুকে মেঝেতে দাঁড় করিয়ে আবু পোষ্টারগুলো গুছিয়ে নেয়। সবগুলি মিলিয়ে দড়ি দিয়ে একটা বাণ্ডিল তৈরী করতে করতে উত্তর দেয়,

ঃ হ্যাঁ খালা অনেক কাজ।

ঃ অনেক কাজ। অ্যা।

তার কথা জড়িয়ে আসে। নিঃঝুম বুকটা টিপ টিপ করতে থাকে। আর কিছু বলতে পারেন না। অসহায় দৃষ্টির মাঝখানে আবুর

চেহারাটা ঝাপসা হয়ে ওঠে। আবুর অলক্ষ্যে নীহার খালা আরেক-বার চোখ মুছে নেন।

কালুর মা চা দিয়ে যায়। একটা পিরিচে আনুষঙ্গিক দুটুকরো মাখন রুটি আর সেদ্ধ ডিম। বাণ্ডিলটা দেয়ালের সাথে খাড়া করে দিয়ে আবুও উঠে দাঁড়ায়।

গরম চায়ের নতুন বাটিতে চুমুক দেয় প্রাণপণে।

ঃ কি রে খালি চা খাচ্ছিস যে। ডিম-রুটিটা আগে—

হঠাৎ নীহার খালা থেমে যান।

ঃ হ্যাঁ, তারপর! থামলে কেন খালা?

হাসতে হাসতে আবু বলে ওঠে। তবু নীহার খালা কোন কথা বলেন না। কথা বলতে হঠাৎ কেন যে তিনি গেলেন তা আবু বুঝতে পারে। বয়স হলেও এমন একটু আধটু ছেলেমানুষি করার মতো মনের সজীবতা তার আছে। আবুর তা ভালোও লাগে এই জন্য যে, অন্য মেয়েদের মতো এটা তার ন্যাকামী নয়। নিজের খালা বলে এজন্য তার গর্ববোধও আঝে।

ঃ সাব্বাস মেয়ে। কাল বিকেলের কথাটা বুঝি ভোলো নি। হু! বুঝতে পাচ্ছি স্মরণ শ.ক্তি তোমার খুব প্রখর। য়্যুনিভার্সিটিতে পড়লে কালি-নারায়ণটা ঠিকই পেতে।

ঃ কালি নারায়ণ-টারায়ণ আমি চাইনে।

তবে কি চাও?

ঃ কিস্‌সু না।

নীহার খালা মুখটাকে ফিরিয়ে নেন অন্যদিকে। কোথা থেকে রাজ্যের কান্না এসে বুকে চেপে বসে ভারী পাথরের মতো।

গতকাল বিকালের ঘটনাটা এমন কিছু না। তবু নীহার খালার খুব লেগেছিলো। বাড়ির বাইরে ঘোর সন্ধ্যা, ভিতরে ঘরে ঘরে

অন্ধকার ঘোরতর। উশকো খুশকো চুল, কঠিন মুখ। আবু কোথা থেকে ঘরে ঢুকলো।

একটা প্লেটে খান দুই শুকনো রুটি আর পাটালি গুড়ের চাকা নিয়ে নীহার খালা ঘরে ঢুকলো। মাখন ফুরিয়ে গ্যাছে সকালেই। অফিস ফেরতা খালুজানের ভুলে তা আনাও হয়নি। তাই বিকেল বেলা পাউরুটি আনার কথাও নীহার খালা বলেন নি। আটা দিয়ে রুটি করেছেন নিজেই আর তা ছাড়া এ পন্থায় খানিকটা নতুনত্ব আছে বলেই নীহার খালার মনে হয়েছিলো। রোজকার একঘেঁয়েমি পাল্টে দিয়েছেন বলে আবুও আনন্দে লাফিয়ে উঠবে এমনি আশা করেই তিনি সারা বিকেল আবুর প্রতীক্ষা করছিলেন। ভেবেছিলেন আবু হয়ত আনন্দের আতিশয্যে চেঁচিয়ে বাড়ীটাকেই খানিকক্ষণের জন্য মাথায় করে নেবে। এমনি আরো কত কিছুই কল্পনা করেছিলেন মনে মনে।

যা আশা করেছিলেন তেমন কিছুই হলো না। বারবার বলা সত্ত্বেও আবু রুটিটুকু স্পর্শ পর্যন্ত করলো না। নির্লিপ্ত উদাসীনতায় কাজের অজুহাত দিয়ে আবু এড়িয়ে গেলো। আশাভঙ্গটা নীহার খালার বুকে নিদারুণভাবে বেজেছিলো। এমন কি কিছু সময়ের জন্য গোটা পৃথিবীটাই তার চোখে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো।

আজ রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কালকের বিকেলটাই নতুন ব্যথায় আবার ফেনিয়ে ওঠে নীহার খালার অন্তরে। অবশ্যম্ভাবী একটা যোগসূত্রও যেন তিনি খুঁজে পান মনে মনে। তা না হলে এমন হয় কেন?

নীহার খালাকে ছাড়া এক মুহূর্ত আবুর চলে না। তবু নিজের বোঝাটা, তা যত দুর্বহই হোক, তা সে একা একাই বইবে। কাউকে তার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না, নীহার খালাকেও না। নীহার খালার সাহায্য পাওয়া যাবে এজন্যই যেন সে কোনো কাজের কথা পর্যন্ত কোন দিন তোলে না। রাস্তায় অনেক লোকের সঙ্গেও সে

একা, আর রাত্রিতে নীহার খালার কাছে থাকেও সে একা। কাজ করতে করতে আবু হয়তো একদিন পাগল হয়ে যাবে, তবু হয়তো নীহার খালার কাছে কিছু বলবে না। এমনি একটা অভিযোগ তার মনে তোলপাড় করতে থাকে। ভাবতে মনটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যে, এমনি করে আবু পরোক্ষভাবে তাকে উপেক্ষা করছে, ব্যঙ্গ করছে তার স্নেহ-মমতার অসারতাকে।

আবু উঠে আসে।

অন্যদিকে ফিরিয়ে নেওয়া নীহার খালার মুখটাকে হাত দিয়ে সে ঘুরিয়ে নেয় নিজের মুখের দিকে।

ঃ আচ্ছা খালা! তুমি কি আমার উপর রাগ করতে পারো?

আবুর কথায় অনুশোচনার উত্তাপ। নীহার খালার হৃদয় ছুঁয়ে যায় গভীর ভাবে। কথা না বলে প্রাণপণ শক্তিতে তবু তিনি চুপ করে থাকেন। ভয় হয় কথা বলতে গিয়ে হয়তো তিনি ডুকরে কেঁদে উঠবেন, ভেঙ্গে পড়বেন চোখের পানিতে। কথা বলা ত হবেই না, আবুর মনটাও দুমড়ে যাবে। এক টুকরো রুটি এনে আবু তুলে ধরে খালার মুখের সামনে।

ঃ লক্ষ্মী খালা! খাও এই রুটিটুকু!

ভিক্ষা চাওয়ার বিশীর্ণ দীনতা ফুটে ওঠে আবুর মুখে। নীহার খালা একটু হেসে ফেলেন। তবু মনটাকে ঘুরিয়ে নিতে নিতে অসম্মতি জানান অনিচ্ছা সত্বেও।

ঃ —ন্ না!

কাল বিকেলের জের টেনে ওকে কষ্ট দেয়ার জন্য মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়েন। এতো সহজ মীমাংসায় সংকোচ বোধটা তাই বড় হয়ে দেখা দেয় তার মনে। তিনি জানেন আবু তাকে ভালোবাসে আর ভালোবাসে দুর্লভ অনুভূতি দিয়ে। এটাই তার একমাত্র কিংবা প্রথম প্রমাণ নয়, পিছনের সমস্ত দিনগুলিতেই, খুঁজলে অসংখ্য সাক্ষী পাওয়া যাবে।

আবু আর কিছু না বলে বাকী চাটুকু এক চুমুকে শেষ করে পাশের ঘরে চলে যায় নিঃশব্দে যেন বহু যুগের বিষণ্ণতায় ভরা একটা পাথরের মূর্তিকে সরানো হলো এক মন্দির থেকে আরেক মন্দিরে। বিছানায় উপুড় হয়ে সে বালিশে মুখ গোঁজে।

নীহার খালাও ঘরে ঢোকেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। এতো তাড়াতাড়ি আবু হাল ছেড়ে দেবে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাই এতে শুধুমাত্র তিনি অপ্রস্তুত হয়েছেন তা নয় তিনি বিচলিতও হয়েছেন। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টায় ওকে কতটুকুই বা তিনি কাছে পান। এক টুকরো আগুনের ফুল্‌কি। হঠাৎ সে জ্বলে ওঠে, জ্বালিয়ে দেয়, পুড়িয়ে দেয়, হঠাৎ-ই আবার নিবে যায়, নিবিয়ে দেয়! এর চেয়ে বেশি করে আবুকে আজো তিনি বুঝতে পারেন নি। একে বুঝে ওঠার কাজটা সহজ নয় নীহার খালা তা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। মনে হয় তার নিজের অনুভূতি ততটা গভীর নয়, তত তীক্ষ্ণও নয়। ওর ব্যাপারে বারে বারে তাই তার ভুল হয়, তিনিও নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। নিজের অসামর্থ্য সত্ত্বেও আবুর এই আকস্মিক চলে আসার সঙ্গে ব্যর্থতা জুড়ে দিয়ে ভাবতে তার কষ্ট হয়। মনটা কেমন যেন হাহাকার করে ওঠে। হৃদয়ে একটা অজানা আশংকার মন্থন চলতে থাকে। নীহার খালা ডাকেন,

ঃ আবু!

আবু মুখ তুলে তাকায়! চোখে কেমন স্পৃহাহীনতা, বৃষ্টি ঘোলাটে। দেখেই বোঝা যায় একটু আগের ঘটনাকেই কল্পনার রঙে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সে নিজের মধ্যে এক বিশ্রী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। আঘাত পেলেই ও এমনি হয়।

ঃ কি?

খালার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় সে মাথাটিকে আবার বালিশের উপর ছেড়ে দেয়।

: কি বলবে বলো না। আর যদি কিছু বলার না থাকে তো সরে যাও।

: ও ঘর থেকে খাবার ফেলে চলে এলি যে!

কথায় মৃদু ভর্ৎসনার সুর। ব্যাপারটা হালকা করার জন্য নীহার খালা আশ্চর্যরকমভাবে সহজ হয়ে ওঠেন। ঝুপ করে বসে পড়েন বিছানার উপরে। একহাতে আবুর মাথাটা ঝাঁকাতে থাকেন।

: বুঝলি আবু! তোর আমার ঝগড়াটা বেশ পুরনো। সেই কাল বিকেল থেকে শুরু! আর তুই কিনা ভাবলি যে এক কথায়ই তাকে মিটিয়ে ফেলবি! আমি তা মানতে পারি? তাহলে যে আমারি হার হয়ে যায়! তুই-ই বল জিতবার চেষ্টা আমি করব না?

কথার শেষে নীহার খালা খিলখিল করে হেসে ওঠেন। আবুও যোগ না দিয়ে পারে না। সেও হেসে ফেলে। দু'জনের অজান্তে দু'জনের মনই হালকা হয়ে যায়, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নীহার খালাকে চমকে দিয়ে দৈনন্দিনতার আরেকটা নতুন অধ্যায় চোখের সামনে আরম্ভ হয়।

: দেখ খালা! তোমার ওই হেরে যাওয়ার কথাটা আগাগোড়াই মিথ্যে। তুমি বুঝি হার মানবার মতো মেয়ে? রোজ রোজ ত তুমিই জিতে যাও আর আমি হারি।

একটু থেমে সে আবার বলে কথার ফাঁকটা পূরণ করার জন্য।

: তবে কি জান খালা! ওটা হারও নয় জিতও নয়!

দুজনে তারা হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই নীহার খালা বলেন,

: জানিস আবু!

: জানিতো অনেক কিছুই! কি?

: তোর বুদ্ধি বড্ড কম?

: কথাটা অপমানকর। তবু মানলাম। অন্য কেউ বললে

মানতাম না। এমন কি হনুমানের মতো নমস্য জীব হলেও না। যাই হোক, তারপর?

: তারপর?

নীহার খালা এমনভাবে শরীর কাঁপিয়ে হাসতে আরম্ভ করলেন যে, দেখে মনে হয় মরে না গেলে তা আর থামবে না।

: আরেকবার সাধলেই আমি খেতাম।

: হ্যাঁ! 'আরেকবার সাধিলেই খাইতাম!'

হো হো করে হেসে ওঠে আবু। ধমকে দেয়াল যেন ফেটে যেতে চায়। দূরে কোথায় যেন ঘণ্টা পড়ে, নটা। আবু চমকে ওঠে, তার হাসি থামে। সে উঠে দাঁড়ায়।

: হাসবার সময়টাই পেলাম না। থাক্‌গে খালা আমাকে ছ' আনা পয়সা দাও তো ঝট্‌পট্‌। তা না হলে এতগুলো পোষ্টার নিই কি করে? সাড়ে নটায় য়্যুনিভার্সিটিতে পৌছাতেই হবে। এগারোটার ভিতরে পোষ্টারগুলো সেঁটে শেষ করতে হবে। বারোটায় আবার মিটিং।

: পয়সা দিচ্ছি। কিন্তু খেতে আসবিনে?

: সময় হবে না। সেজন্য ভেবো না। আর আমার জন্য বসে থেকে সারাদিন না খেয়ে থেকো না কিন্তু।

: আসবিনে কেন? না আসবি!

নীহার খালা অনুযোগ করেন।

: তোমার সাথে বসে খেতে আমারো ভালো লাগে না বুঝি? কিন্তু করব কি? সময় হবে না আজ। তাই বলে তোমার না খেয়ে শুকোতে হবে নাকি?

নীহার খালা ছ' আনা পয়সা এনে আবুর হাতে তুলে দেন। পকেটে গুঁজে দেন এক টাকার একটা নোট।

: টাকাটা দিয়ে কিছু খেয়ে নিস। মনে থাকে যেন আমার কথা।

বুঝলি খাবি কিন্তু মনে করে। কালিমাখা সার্ট-পাজামা বদলে যা।
নীহার খালা নিজেই সার্টটা টেনে খুলে দিয়ে আরেকটা এগিয়ে দেন।

: এবার পাজামা বদলে নে।

নীহার খালা আবুর হাত ধরে আরেকবার অনুনয় করেন।

: খেয়ে নিস্ বাবা! মনে থাকে যেন। আসলে কিছুতেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না তাকে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সে বসে খেতে পারবে। খেতে বসে কাছে নীহার খালা নেই দেখে হাত ঝাড়া দিয়ে সে হয়তো উঠে যাবে, বহুবার দেখেছেনও এমনি।

কাপড় পরে তৈরী হয়ে আসে আবু। চোখে-মুখে দারুণ ব্যস্ততা। দিনের আলোকে ওকে যেমনটি দেখা যায়। গলায় উৎকণ্ঠা নিয়ে নীহার খালা জিজ্ঞাসা করেন,

: আবু! চুয়াল্লিশ ধারা নাকি দিয়েছে?

: হ্যা! ভেবেছে চুয়াল্লিশ ধারার ধমকেই সব ফেঁসে যাবে।

: চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙ্গতে গেলে মারবে যে।

: সে ওদের মর্জ্জি! আমরা ঠিক করেছি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করবোই।

উদ্বেগে এবার নীহার খালা ভেঙ্গেই পড়েন।

: আবু! তোকেও মারবে?

আবু অতিকষ্টে হাসিটাকে জামিয়ে রাখে।

: আচ্ছা পাগল তো! পুলিশরা বুঝি জানে যে আমাকে মারলে নীহার খালার খুব কষ্ট হবে? না! না! না! অমন কাজ পুলিশের মত ফেরেশতারা কি করতে পারে?

নীহার খালা হঠাৎ তিরিক্ষে হয়ে ওঠেন,

: বেশ করে তোকে মার দিক।

: ও মা! সেকি?

: তুই তো আর কথা শুনবি না আমার!

ঃ তাই না ?

আবু হেসে ওঠে। পোষ্টার নিয়ে বেরিয়ে যেতে আবার ফিরে আসে।

ঃ খালা ! খালা !!

আবু চেঁচিয়ে ডাকে। নীহার খালা রান্নাঘর থেকে ছুটে আসেন,

ঃ কি ? কি কে ?

বিকেল বেলা যখন ফিরে আসবো তখন কিন্তু আবার হাসবো আমরা হ্যাঁ। হাসতে আমার খুব ভালো লেগেছিল। তোমারও কিন্তু খুব হাসতে হবে। বুঝলে ?

হন্তদন্ত হয়ে আবু ছুটে বেরিয়ে যায়।

নীহার খালা তক্ষুণি হেসে ফেলেন মনে মনে। বদ্ধ পাগল এই আবুটা। আর এই পাগলামিটাই ওকে এতো মিষ্টি করেছে তার কাছে। তাই পাগলামি ছেড়ে যখনি সে ভালো মানুষের মতো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখনি ওকে অস্বাভাবিক লাগে, বুকের ভিতরটা খচখচ করতে থাকে।

দুই

য়্যুনিভার্সিটির মাঠ থেকে শহরের যে রাস্তাগুলি দেখা যায় তার উপর দিয়ে কয়েক হাত পর পর টহলদারী সশস্ত্র পুলিশ। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশের একেকটা দল মোতায়েন করা হয়েছে। ডাইনে বায়ে যেখানে দৃষ্টি যায় সেখানেই পুলিশ। লোহার টুপি পরা পুলিশদের হাতে হাতে গুলী ভরতি রাইফেল, কোমরে টিয়ার গ্যাসের বাক্স অথবা মোটা প্যান্টের সঙ্গে আঁটকানো কার্তুজ ভরা ছোট ছোট থলি। য়্যুনির্ভার্সিটি গেটের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড। অপরদিকে অগুণতি কালো মাথায় ঠাসা য়ুনিভার্সিটির মাঠটাকে মনে হয় মৌচাকের মতো।

তুমুল বাকবিতণ্ডা, হৈ-হুল্লোড়ের শেষে দশজন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করবার অনড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। কয়েক হাজার কণ্ঠের ঘন ঘন শ্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো, সারা শহরটাই যেন কেঁপে উঠলো থরথর করে।

ঃ রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই।

ঃ নাজিম-নুরুল—গদি ছাড়ো।

ঃ ভাষার উপরে হামলা—চলবেনা।

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে দশজনের এককেটা গ্রুপ বেরিয়ে আসতে লাগলো। ইতিমধ্যেই দুটো পুলিশ ভ্যান চুয়াল্লিশ ধারা অমান্যকারীদের দুটো গ্রুপ নিয়ে গ্যাছে লালবাগের দিকে। ভয়লেশহীন ক্রুরমুখে মানুষগুলো তড়পাতে থাকে যুদ্ধের ঘোড়ার মতো।

ক্রমশঃই পিছনে ঠেলাঠেলি বাড়ে। যে করে হোক একটা গ্রুপে সামিল হবার জন্যে মানুষ হন্যে হয়ে উঠেছে।

কড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করার মতো মৃদু কটকট আওয়াজ ওঠে কোথা থেকে। এক সাথে যেন কতকগুলি বুদবুদ ফাটছে নিকটে কোথাও। শেষ গ্রুপের দু'জন ছাত্র হঠাৎ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যায়। অব্যর্থ বুলেটে একজনের গোটা মাথাটাই উড়ে গেছে। চারিদিকে ছুটোপুটি পড়ে যায়, পুলিশরা চঞ্চল হয়ে মাথার টুপি ঠিক করে। আবার ট্রিগার টিপে। লাঠি পড়ে। টিয়ার গ্যাস ফাটে।

মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আরো তিনজন। ব্যাপারটা এতক্ষণে কারো আর বুঝতে বাকি থাকে না। উত্তেজিত জনতা শ্লোগান দিয়ে ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তারা গিয়ে থামে মধুর ষ্টলে, য়্যুনিভার্সিটি বিল্ডিংয়ে, পুকুর ঘাটের শান বাঁধানো সিঁড়ির তলায়, অমি গাছের আড়ালে। গুলী চালানো সত্ত্বেও এখান সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন আওয়াজ ওঠে।

ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

ঃ নাজিম-নুরুলের ফাঁসি চাই।

ঃ খুনি জল্লাদের বিচার চাই, দমন নীতি চলবে না।

গুলীবিদ্ধ আহতদের রক্তাক্ত দেহ নিয়ে রিক্সাওয়ালারা ছুটে যায় হাসপাতালের দিকে। কারো আদেশ-নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে না। রাইফেল হাতে লোহার টুপি পরা পুলিশের দল ঢুকে পড়ে য়্যুনিভার্সিটি মাঠে। আবার লাঠি চলে, টিয়ার গ্যাস ফাটে। ধোঁয়া ওঠে। গুলী চলে।

শেষবারের মতো গুলীবিদ্ধ একজনের কণ্ঠনালী চিড়ে শ্লোগান ওঠে,

ঃ রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই।

গুলীবিদ্ধ টলটলায়মান পতনোন্মুখ দেহটায় সজোরে একটা লাথি মেরে ঘৃণাবিকৃত মুখে সামনের দিকে এগিয়ে আসে লালমুখো সার্জেণ্ট। আরেকটা শিকারের খোঁজে হাতে উদ্যত পিস্তল। গড়াতে গড়াতে দেহটা গিয়ে স্থির হয় রাস্তার পাশে ড্রেনের থকথকে কাদায়। একটা উদ্ধত ঘোষণা নিবে যায় চিরদিনের মতো।

গুলীবর্ষণ। লাঠি চার্জ। বেয়নেটের আক্রমণ। টিয়ার গ্যাস।

বিদ্যুত বেগে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে আর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে। পুরুষেরা লাফ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ। খবরটা বিষ মাখানো চাবুকের ঘা দেয় সকল মানুষের পৌরুষে। উগ্র আত্মাবমাননা বোধে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অসহ্য ঘৃণায় মেয়েরা ঘরের কাজ বন্ধ করে।

চোখের পলকে দোকান পাট বন্ধ হয়, দোকানী বেরিয়ে আসে। অফিসে কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয় মসিজীবী। বেবিয়ে আসে বেয়ারা আর কেরানী। খণ্ড মিছিলে মুহূর্ত্তে সারা শহর আর আশেপাশের গ্রামাঞ্চল ছেয়ে যায়। প্রস্তুতির নতুন আহ্বান জানিয়ে দেয়ালে দেয়ালে নতুন পোষ্টার পড়ে। শহরে তোলপাড় হতে থাকে।

মেয়েদের অন্তঃপুরে ঢেউ এসে আঘাত করে। উত্তেজনায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মেয়েরা ঘরময় পায়চারী করে বেড়ায় ঘনঘন। অকারণে হঠাৎ জানালা খুলে দড়াম করে আবার তা বন্ধ করে দেয়।

গোলাগুলীর খবর শুনে নীহার খালা প্রথমটা আঁতকে উঠেছিলেন। তারপরেই তাঁর চিন্তার ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গ্যাছে। দুর্বোধ্য সংকেতে চোখের পাতায় ক্রমাগত কি একটা মায়াবী স্বপ্ন কেবলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। তিনি হাঁটছেন কি বসে আছেন সে কথা বুঝবার মতো স্নায়বিক সবলতাও আর অবশিষ্ট নেই। হঠাৎ তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়। যেন কোনো ভূত দেখেছেন। সম্মুখে দণ্ডায়মান লোকের উপর তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে। অচেনা, অজানা একটা কুৎসিৎ মুখ। চোয়ালের উঁচু হাড় দুটো মুখটাকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। জমাট আলকাতরার মতো গায়ের রং। ময়লা কালো সুতোয় বাঁধা একটা চৌকোণ সীসার কবজ গলায় ঝুলছে। ঘামে ভেজা স্যাঁতসেঁতে মুখ, গায়ের ময়লা হলদে রঙের গেঞ্জিটাও ঘামে ভিজে শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। আঁতকে উঠে নীহার খালা দু'পা পিছিয়ে যান।

ঃ কে। কে তুমি।

ঃ আমি রিকসাওয়ালা মা ছাব।

মাটির দিকে চোখ রেখেই লোকটা বিড়বিড় করে জবাব দেয়। কথা বলেই লোকটা মাথা ঘুরিয়ে হঠাৎ দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় তীরের বেগে। পরক্ষণেই আবার ফিরে আসে ভারী পায়, নির্বাক নীচু মাথায়। পিছনে সমগোত্রীয় আরো তিনজন লোক। কালো, কুৎসিৎ ঘামে ভেজা। একটা রক্তাক্ত দেহ তারা ধরাধরি করে নিয়ে আসে অত্যন্ত সাবধানে। মৃত দেহটা মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে স্খলিত পদে লোকগুলো বেরিয়ে যায়। ধরা পড়ার ভয়ে কয়েকজন ভীরু লোক যেন পালিয়ে গেলো আসন্ন কোন কিছুর খপ্পর থেকে।

মৃত দেহটার উপর একবার তাকাতে চেষ্টা করেন নীহার খালা।

পরিপূর্ণভাবে দেখার আগেই হিমশীতল একটা তরবারির তীক্ষ্ণ মুখ যেন তার কলজে ভেদ করে পার হয়ে যায়। নীহার খালা হাহাকার করে উঠেন।

ঃ আহ—হারে! আবু! আবু আমার।

দু'হাতে মৃত দেহটা আঁকড়ে ধরে টেনে তুলে আনেন বুকের উপর। চেপে ধরেন একবারে সজোরে, আলগা করে আবার চেপে ধরেন। নিজের প্রাণের গহ্বরে যেখানে উত্তাপ আছে আবুর ঠাণ্ডা মৃত দেহটাকে যেন সেখানে সেধিয়ে দিতে চান।

ঃ আবু! আবু! কথা বলবিনে? কেন? কেন? কেন রে? আমিতো রাগ করিনি।

প্রাণের সমস্ত উত্তাপ বুঝি চোখের পানিতে ভিজে গ্যাছে। তাই আবু সাড়া দেয় না, কথা বলে না।

মৃত মুখটাকে বারবার নীহার খালা তুলে ধরেন নিজের মুখের কাছে। অভিমান, অভিযোগ, দুরন্তপনা কোন কিছুর চিহ্নই আর নেই। রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখে জ্যোৎস্না প্লাবিত আকাশের একঘেয়ে পাণ্ডুরতা, বিষণ্ণ নীলের স্তিমিত আভা। থেকে থেকে নীহার খালা ডুকরে ওঠেন।

ঃ আবু—আবু! আবু—উ!

বুক ফাটানো আর্তনাদে তিনি মাথা কুটতে থাকেন। কিছুতেই তাঁর বিশ্বাস হয় না অবাধ্যতায় আবু এতো অমানুষিক, এতো মৌন। তাই বাববার তিনি আবুকে কথা বলাতে চেষ্টা করেন, অনুযোগ করেন, মিনতি জানান।

ঃ আবু! আবু! কথা বল, বল, বল! আমি যে তোর খালা, নীহার খালা।

আবুর বুকে মুখ গুঁজে নীহার খালা চিবুক ঘষতে থাকেন। এখনো তাঁর ধারণা ও তো বেঁচেই আছে। ঘর্ষণে তাই ওর স্পন্দন জাগাতে চেষ্টা করেন।

কোথা থেকে কতকগুলি ভারী বুটের আওয়াজ এসে মৃত দেহটার সামনে থেমে যায়। একটা লোহার যন্ত্রকে গতি পরিমিত করে চাবি দিয়ে ছেড়ে দিলে যেমন কোন নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে একেবারে থেমে যায় তেমনি পাঁচজন পুলিশ নিয়ে একজন পুলিশ অফিসার এসে থামে। তারা কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকে অসহিষ্ণু পায়ের উপর। তাদের সময় জ্ঞান, কর্তব্যবোধ একের পর এক তলিয়ে যেতে থাকে তন্ময় সমুদ্রে নিমজ্জমান ভারী নুড়ির মতো। একটা রহস্যময় পদছন্দে দুলতে থাকে তাদেরো মন। পুলিশ অফিসার হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বেটনের আগা দিয়ে একজন কনেষ্টবলকে খোঁচা দেয়। লোকটা টাল সামলে বুটে বুটে ঠোকাঠুকি করে, রাইফেলটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে উঁচু করেই নামিয়ে নেয়। পুলিশ অফিসার কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে ইঙ্গিত করে।

কান্নার প্রচণ্ড বেগে নীহার খালার দেহটা তখনো আন্দোলিত হচ্ছিল আবুর দেহের উপর। পুলিশরা এপা ওপা করে অস্বস্তিতে। নালমারা বুটের মৃদু আওয়াজ উঠে মেঝের উপর! নীহার খালা তখনো আর্তনাদ করে চলেছেন।

: আবু! আবু! কথা বল! বল·········

প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার পাঁজরার হাড় মড়মড় করে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার বেটন উঁচিয়ে মূর্তি পরিগ্রহ করে। ভাবলুতার প্রশ্রয় আর দেওয়া চলে না। সরকারী দায়িত্ব আরো মূল্যবান। তাই গর্জে উঠে পুলিশ অফিসার,

: কেয়া দেখ্‌তে হ্যায়। লাশ ছিন্‌ লেও। ছিন্‌ লেও।

তখন তখনি পুলিশরা তবু লাশটার গায়ে হাত উঠাতে পারে না। বিশৃঙ্খল ভাবে মেঝেময় নড়াচড়া করে। কি এক শ্রদ্ধাবোধে ওদের হাতগুলো অবশ হয়ে গিয়েছে।

মুখ বিকৃত করে পুলিশ অফিসার আবার হুঙ্কার ছাড়ে,

ঃ কেয়া দেখ্‌তা হ্যায় শালা লোগ ? লাশ ছিন্‌ লেও। এইসা ঘুস্‌ঘুস্‌ মাত করো।

কথাটা নীহার খালার কানে যেতেই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে ওঠেন। চোখের পানি শুকিয়ে গিয়ে সেখানে দেখা দেয় চৈত্র দুপুরের খর দ্যুতি। দু'জন পুলিশ এসে তাঁকে আটকে রাখে।

ধরাধরি করে নিয়ে বেরিয়ে যায়। বুটের শব্দ ক্ষীণতর হতে থাকে। সাড়াশী বন্ধনের ভিতর থেকে নীহার খালা চীৎকার করতে থাকেন।

ঃ ছেড়ে দাও আমাকে। আমার আবুকে নিয়ো না। নিয়ো না আমার আবুকে।

না! না! না! বলছি নিয়ো না! নিয়ো না আমার আবুকে নিয়ো না।

বাইরে বুটের শব্দ মিলিয়ে যেতেই পুলিশ দু'জন নীহাব খালাকে ছেড়ে দেয়! নীহার খালা ছুটে যান তাদের পিছনে পিছনে। প্রার্থনা জানান বুক ফাটানো কান্নায়।

ঃ শোনো! ওকে নিয়ো না। পরে এসে না হয়ে নিয়ে যেও। ওযে আমার হাসি দেখতে চেয়েছিল! আমার হাসি!

নীহার খালার বিলাপ ছাপিয়ে পুলিশ ভ্যানের ষ্টার্টারটা গর্জে ওঠে।

চলন্ত গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নীহার খালা হঠাৎ হেসে ওঠেন প্রচণ্ড অট্টহাসি। মধ্য রাতে ধ্বংসোন্মত্ত প্রেতিনীর অশরীরী হাসির মতো ভয়ঙ্কর, অসহ্য সুন্দর।

ঃ হাঃ। হাঃ। হাঃ! হাঃ!

সহসা হাসির ধমক থামে।

ঃ আবু! আবু! দেখে যা আমি হাসছি। তুই যে দেখতে চেয়েছিলি, দেখে যা! দেখে যা!

আবার তিনি হেসে ওঠেন।

ঃ হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ·····হিঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ!······

সেই থেকেই নীহার খালা হেসে চলেছেন। সকাল সন্ধ্যায়, দুপুরে, মধ্য রাত্রিতে। যখনি আবুর কথা মনে হয় তখনি হাসেন।

সে হাসি কখনো থামবে না।

দৃষ্টি

আনিসুজ্জামান

পঁচিশ বছর কেরানীগিরি করলে চোখের আর কি শক্তি থাকে! তাছাড়া, চোখ খারাপ অনেক দিনের। চশমা নিয়েছিলেন সেই যখন ক্লাশ সেভেনে পড়তেন। সেদিন রাত্রে ঝড়ের সময় জানালার ছিটকিনি খুলে কপাটটা ধাক্কা দিল টেবিলটায়। টেবিলের ওপরে রাখা মোটা লেন্‌সের চশমাটা টেবিল থেকে পড়ে গেল নীচে। খান দুই ইঁট দিয়ে তক্তপোষটা উঁচু করা ছিল। চশমাটা সুতো দিয়ে বেঁধে পরা চলত: কিন্তু দৌড়ে আসতে গিয়ে সালেহা পা চাপিয়ে দিল তার ওপর।

আরেকটা যে কিনবেন, সে ভরসা সাদত সাহেবের আছে। তবে কবে, সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, পেনসনের টাকা ঠিকমত পাচ্ছেন না। আসাদ যা মাইনে পায় তাতে সংসার কোনমতে চলে। সালেহার বিয়ে দেওয়া দরকার: কিন্তু এ অবস্থায় সম্ভব হচ্ছে না। আসাদের বিয়ে হয়েছে অবশ্য: আল্লায় দিলে একটা বাচ্ছাও হবে এবার।

চশমাটা ভেঙ্গে যাওয়ায় বড় অসুবিধায় পড়েছেন সাদত সাহেব। চোখ না থাকলে মানুষের আব যেন কিছুই থাকে না। ঘর ছাড়া কোথাও বেরোন না—তাও ঘরের জিনিসগুলো যদি অস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষ বাঁচে কি করে! বোবা কথা না বলতে পারলেও দেখতে তো পায়—তিনি ভাবেন—আবার ভাবেন, চোখে দেখেই বা কি হয়, যদি কথা না বলতে পারা যায়! চিন্তাগুলোকে ঠেলে দিয়ে সাদত সাহেব হাঁকেন, 'সালেহা, একটা পান দিয়ে যা তো মা।'

পান নিয়ে আসে হাসিনা—আসাদের বৌ। 'পান নেন' শুনেই বুঝতে পারেন সাদত সাহেব। বলেন, 'সালেহা কোথায় ?'

'আছে ঘরে।'

'তাকে দিয়ে পাঠালেই পারতে। তুমি এ সময়ে কম নড়াচড়া করো মা।'

স্নেহের এ অভিযোগ শুনে হাসিনা হাসে। ভারী ভাল মানুষ তার শ্বশুরটি। সে জানে কি আশায় উজ্জীবিত হয়ে ও কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে বুড়ো শ্বশুরের মুখ থেকে। অন্য কথায় আসে হাসিনা। বলে, 'চশমাটা আপনি কিনে নিলেই পারতেন। কিছু টাকা ঘরে ছিল—আর কিছু ধার করে—সামনের মাসে তো শোধ দেওয়া যেত।' সাদত সাহেব হেসে উত্তর দেন, 'এ সময়ে ঘরে টাকা-পয়সা কিছু রাখা দরকার। পুরোনো লোকের অনেক সেবা করলে মা—এবার নতুন লোকটির যত্ন নিতে হবে।' হাসিনা চলে আসে।

সালেহা এল এবার দৌড়ে। বললে, 'আব্বা, কি হয়েছে জান ?'

'কি মা ?'

'মেডিক্যাল হোষ্টেলে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ছাত্রেরা বিক্ষোভ করছিল। পুলিশ গুলী চালিয়েছে।'

'গুলী !' সাদত সাহেবের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

'হ্যাঁ। কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে, লাঠি চালিয়ে, গ্রেপ্তার করেও কিছু হয় নি। শেষে গুলী চালিয়েছে। ছ'জন মারা গেছে।'

'ছ'জন !'

'ছ'জন মারা গেছে, আরো আহত হয়েছে।

'তোকে কে বললে ?'

'বাচ্চু। ও এতক্ষণ ছিল সেখানে। গুলী চালাবার পর চলে এসেছে।'

'কি আশ্চর্য !' সাদত সাহেব এতক্ষণে তাঁর চেতনায় ফিরে

আসেন। বৃটিশ আমল এর চেয়ে খারাপ কি ছিল? এ কয় বছরে কম জায়গায় তো আর গুলী চলল না।

'আমাদেরকে কি বোবা হয়ে থাকতে হবে নাকি!' সালেহার গলার স্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। সে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

রুদ্ধ ঘরে সাদত সাহেব ভাবতে থাকেন, মানুষ থাকার অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে যেন দুনিয়াটা, আরো নানান কথা।

ভাবনার মাঝে আসাদ এসে পড়ে। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করেন :

'সত্যিই ছ' জন মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।' আসাদ অবসন্নভাবে বলে।

বৃদ্ধ আবার চিন্তায় ডুবে যান।

ঘুম থেকে উঠেই সাদত সাহেব খোঁজ নেন আসাদের। হাসিনা বলে, 'অফিসে চলে গেছেন।'

'এত সকালে!'

'সকাল আর কোথায়!' আজ শুক্রবাব, সকালে অফিস।'

সত্যিই, সকাল আর কোথায়! উঠতে দেরী হয়ে গেছে তাঁর। রাইফেলধারী সৈন্যদের ঘন ঘন পদশব্দ কাল অনেক রাত জেগে শুনেছেন তিনি!' চা নিয়ে এসে সালেহা বলে, 'ভাইয়াদের অফিসে আজ ধর্মঘট হতে পারে। ভাইয়া বললে যদ্দুর সম্ভব চেষ্টা করবে। কিন্তু ভাইয়ার যদি চাকরী চলে যায়, আব্বা?' গভীর আশায় ভর করে কথা বলতে গিয়েও সালেহার মনে আসে প্রচ্ছন্ন হতাশা।

সাদত সাহেব অন্যমনস্কভাবে বলেন, 'না চাকরী যাবে না।' তবু কথাটা তাঁকে ভাবিত করে তোলে। ভাবনার কি আর শেষ আছে মানুষের!

পথ-ঘাট নিস্তব্ধ। গাড়ী ঘোড়ার-আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না—আজ সব বন্ধ। চারজনের বেশী লোক এক সাথে চলছে না। সব

তাই কেমন মৃত্যুর মত স্তব্ধ। কিন্তু মৃত্যুর মত শান্ত নয়; একটা চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে সারাটা শহর।

মৃত্যুর কথায় নিজের মৃত্যুকে মনে পড়ে যায় বৃদ্ধের। তিনি মরে যাবেন, তারপর কে থাকবে? হয়ত আসাদও যাবে। কে রইবে তখন? আসাদের ছেলে মেয়েরা? নিজেকেই উত্তর দেন। নিশ্চিন্তও হন কিছুটা, খানিকটা ভরসাও খুঁজে পান সে অনাগত উত্তরাধিকারের চিন্তায় যেন। তাঁর সজীব রক্তের উষ্ণতায় বৃদ্ধের হিম হয়ে আসা বুকটাও উষ্ণ হয়ে উঠে।

কে যেন কড়া নাড়ে। সালেহাকে ডেকে দেখতে বলেন তিনি। দরজা খোলার আওয়াজ পান। সালেহা বলছে, 'কি খবর হালিম ভাই?'

উত্তরটা আর শুনতে পান না তিনি। হালিম ছেলেটা আসাদের সাথে চাকরী করে, কাছেই থাকে। কি ব্যাপার!

কয়েকজনের পদশব্দ শুনতে পাওয়া যায় পাশের ঘরে। হাসিনা আর সালেহা ডুকরে কেঁদে ওঠে। সাদত সাহেব বলেন, 'কি হল সালেহা—হাসিনা—।' তক্তপোষ থেকে পা নামিয়ে চটি পায়ে দেন। চশমা নেই, এগুতে পারছেন না। সালেহা এ ঘরে আসে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ভাইয়ার গুলী লেগেছে—মারা গেছে।' এবার থেমে থেমে হালিমের গলা শোনা যায়ঃ 'অফিস ষ্ট্রাইক হয়ে প্রোসেশন বেরিয়েছিল—পুলিশ গুলী চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ও। হাসপাতালে দিলে লাশ যদি না পাওয়া যায়, সেই ভেবে ডাক্তারখানা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে থেকে নিয়ে এসেছি।'

সালেহা সাদত সাহেবকে ধরে এ ঘরে নিয়ে আসে। সে কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। হাসিনা আছড়ে পড়েছে মৃতদেহের ওপর। কাঁদছে।

তার পেটের বাচ্চটা বুঝি হঠাৎ নড়ে উঠল—

সাদত সাহেব এতক্ষণে কাঁদতে থাকেন। মৃতদেহের ওপর হাত

বুলাতে থাকেন তিনি। দেখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। আসাদ কোথায় রে? আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে।' কিন্তু দৃষ্টি কেবল ঝাপসাই হয়ে যাচ্ছে তাঁর—অস্পষ্টতা বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে এ অস্পষ্টতা আর কোন দিন দূর হবে না, আর কোনদিন দেখতে পাবেন না। কোনদিন না? হাসিনার বাচ্চাটাকেও কি দেখতে পাবেন না?

হাসিনার না হওয়া বাচ্চার চেহারাটা মনের ভেতর আঁকতে থাকেন, দেখতে চান প্রাণপণে। কান্নাটা থেমে আসে আস্তে আস্তে।

পলিমাটি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

তেইশে ফেব্রুয়ারী।

শহরের নীল আকাশতলে জন-সমুদ্রের অশান্ত একটানা গর্জন।

শহরের বাতাসও আজ ভারী। ফিস ফিস কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসে ফাল্গুনের বাতাসে। ছোট্ট একটা মিছিল অজগরের মত সর্পিল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে—শহরের পিচঢালা পথ ধরে। কারো মুখে কথা নেই—নেই অসংলগ্ন বেখাপ্পা আলাপ। মাঝে মাঝে বুকের অসহ্য জ্বালায় চিৎকার করে ওঠে মিছিলের লোকগুলো। দুপুরের রদ্দুরে মিছিলের মুখগুলোকে দেখাচ্ছে এক একটা গরম লোহার টুকরোর মত লাল। শুধু আঘাতের দেরী মাত্র। আঘাত পেলেই গরম লোহার মত সম্পূর্ণ ঢঙটাই বদলে যাবে।

পুলিশ অফিসের হলদে দালানটার জানালা দিয়ে চলন্ত মিছিল-টাকে দেখছেন আবু জহির সাহেব। জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বলে আজো যাঁর নাম ডাক আছে। টেবিলে জি, ই, সি ফ্যানটা ঘুরছে টপ স্পিডে। তবুও গরম লাগছে জহির সাহেবের। অসহ্য দম ফাটা গরম। গায়ের সার্টটা ভিজে গেছে ঘামে। জহির সাহেবের মাথাটাও ঘুরছে বোঁ বোঁ করে। চোখের কোলে কালো দাগ পড়েছে। গত রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি জহির সাহেবের। আর ঘুম কি করে হবে। দুশ্চিন্তার ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। সারা-রাত শুধু আতঙ্ক আর বিভীষিকার মধ্যে কেটেছে। সকাল হতেই ছুটে এসেছেন অফিসে।

জহির সাহেব ভাবছেন। ভাবনার কূল নেই, কিনারাও নেই। শহরের বুকে পা দিতেও তাঁর আজ ভয় করে। কী হল শহরের

লোকগুলোর। প্রতিটি নাগরিক যেন গুলী-খাওয়া ক্ষ্যাপা বাঘ, যে, কোন মুহূর্তে লাফিয়ে পড়তে পারে ঘাড়ে। জানালার পাশ থেকে সরে এসে ঘরের মধ্যে কতক্ষণ পায়চারী করলেন জহির সাহেব। কুমড়োর মত গোল মুখে ঘাম দেখা দিচ্ছে বারে বারে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা ভালো করে মুছে নিলেন। মাথায় অসংখ্য ভাবনা। শহরের অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে না পারলে কি যে হবে, খোদাই জানেন। হেড অফিস থেকে নির্দেশ এসেছে—যে ভাবেই হোক থামাতে হবে গোলমালকে। একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারী করে হোক—যে ভাবেই হোক—যেমন করেই হোক রুখতে হবে অশান্ত নাগরিকের কার্য্যকলাপকে। হুঁ। জহির সাহেব তাচ্ছিল্যের সংগে একটা শব্দ করে উঠলেন। গুলী চালান মুখের কথা কিনা! ছেলের হাতের মোয়া আর কি। ঢাকার কর্তাদের মত দুর্বুদ্ধি জহির সাহেবের হয়নি। মাথাটা তাঁর এখনো বেশ সুস্থই আছে। ঢাকায় তো গুলী চালিয়েছে—তাতে কি হলো? হলো উল্‌টো। যারা গুলী খাওয়ার জন্যে তৈরী ছিল না, তারাও তৈরী হল। যত সব উজবুক হুঁঃ। ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—। ফোনে কল এসেছে। কোথা থেকে ডাক পড়ল কে জানে। যত সব। জহির সাহেবের চকচকে সমতল চামড়ার মুখটা কুঁচকে গেল অসীম বিরক্তিতে আর রাগে।

ঃ হ্যালো। কে? ইয়েস এস, পি, স্পিকিং।

ফোনের ওপাশের জবাবে মুহূর্তে জহির সাহেবের মুখটা ঝলমল করে উঠল বিনয়ে আর হাসিতে। গলার চড়া সুর কোমল হয়ে গেল যতটা সম্ভব। তারের ওপাশ থেকে আবার কথা ভেসে এল,

ঃ আপনার শহরের সিচুয়েশন কেমন?

ঃ আপাততঃ ভালোই স্যার। কোন ডিস্‌টারব্যান্স এখন আর নেই।

ঃ গুড। খারাপ হলে এ্যাটওয়ান্স ওয়ান-ফরটি ফোর এপ্‌লাই করবেন। বুঝলেন?

: ইয়েস স্যার।

জহির সাহেব কতক্ষণ থেমে, অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন,

: স্যার একটা কথা বলব ?

: কি বলুন ?

: ঢাকার অবস্থা এখন কেমন স্যার ?

: বিশেষ ভালো নয়। তবে শীগ্গীরই সিচুয়েশন ট্যাকল্ করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

: স্যার, গুলী না চালালে এত হাঙ্গামা হত না।

: আশা করি ভুলে যাবেন না আমি আপনার বস। যা বললাম তাই করুন। যেভাবেই হোক সিচুয়েশনকে ট্যাকল্ করতেই হবে।

: ইয়েস স্যার।

ট্রাঙ্ক-কলের কনেকশনটা কাটআপ হয়ে গেল। জহির সাহেব গুম হয়ে বসে রইলেন কতক্ষণ। জহির সাহেবের মুখে কে যেন এক খাবলা কালি ছুঁড়ে মেরেছে। এত শক্ত জবাব যে উপরওয়ালা দেবেন তা তিনি আশা করেন নি। ছিঃ ছিঃ! তাঁর কি প্রয়োজন ছিল ফাল্তু কথা বলার। ঠিক হয়েছে, উচিৎ শাস্তি হয়েছে। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিলেন জহির সাহেব। ধুত্তর এত ভাবলে কাজ চলে ? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতেই হবে। তবুও হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতে পারছেন না জহির সাহেব। ঝানু পুলিশ অফিসার তিনি। এতো আর রাতারাতি বড়কর্তা হওয়া নয়। এর জন্যে অনেক ত্যাগ, অনেক অপমান, অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু দেশের অবস্থা বদলেছে এখন। ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে সাদা-সবুজ ঝাণ্ডা উড়ছে ঘরে ঘরে। কয়েক বছর আগের কথা ভেসে উঠল জহির সাহেবের অন্তর-আকাশে। ইংরেজের রাজত্ব। উড সাহেব তখন পুলিশের বড়কর্তা। জহির সাহেব দেখেছেন কি করে গরম মানুষকে বরফের মত ঠাণ্ডা করতে হয়। কোথাও আন্দোলন শুরু হয়েছে, দাও দাংগা লাগিয়ে। দাংগার সপক্ষে লিফলেট ছড়াও।

গুণ্ডা লাগাও। সরকার বিরোধী লিফলেট ছড়িয়ে এ্যারেষ্ট কর বড় বড় চাঁইগুলোকে—এই না বুদ্ধি। আর এখন কথায় কথায়…। উজবুক সব। বুদ্ধির 'ব' নেই মাথায়—আছে শুধু গোবর। উড সাহেবের একটি কথা আজও জহির সাহেবের মনে পড়ে। উড সাহেব বলেছিলেন—বুঝলে মিঃ জহির, পুলিশের চাকরী করতে হলে ঠাণ্ডা মাথা চাই। ঠাণ্ডা মাথায় সব কিছু বিচার করবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবে। মানুষকে বুঝতে দেবে না যে, তুমি খারাপ, তাহলেই অনেকদিন নিশ্চিন্তে চলতে পারবে। মোদ্দা কথা তোমার নীতি হবে, ডিভাইড এণ্ড রুল, বুঝলে? জহির সাহেব ভালো করেই বুঝেছেন। তাই তো হঠাৎ কিছু একটা করতে পারেন না। তাই উড সাহেবের নাম মনে পড়লে আপনি নত হয়ে আসে তাঁর মাথা।

ঃ সাহেব আছেন? অফিসের বাইরে গার্ডকে কে যেন জিজ্ঞেস করল।

জহির সাহেব নড়ে-চড়ে বসলেন।

ঃ আচ্ছালামু আলায়কুম।

ঘরে ঢুকলেন এ্যাডিশন্যাল এস. পি খয়রাত হোসেন সাহেব। মাঝারি ধরনের লোকটি। ভাদ্র মাসের পাকা তালের মত মসৃণ টাক মাথায়। তাড়াতাড়ি কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত।

ঃ ওয়া-আলায়কুম আচ্ছালাম। আসুন তারপর খবর কি?

ঃ আর খবর স্যার! ভয়ে হাত পা পেটে ঢুকে যাবার অবস্থা। পুলিশের চাকরীতে সুখ নেই। সুখ ছিল এক জমানায়।

ঃ কী হল? খুলেই বল না।

ঃ ওদের লিফ্‌লেট আর পোষ্টারগুলো দেখেছেন?

ঃ কিছু কিছু দেখেছি।

ঃ কি সর্বনাশের কথা। দেখলে চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে যায়। জালিম সরকারের অবসান চাই। ছাত্র হত্যার প্রতিকার চাই।

আরো কত কি ! বলে কি না পুলিশ-জুলুম বন্ধ কর। কি সর্বনাশের কথা !

জহির সাহেব গুম হয়ে গেলেন। কি হলো লোকগুলোর— নিরীহ লোকগুলো কোন যাদু-মন্ত্রবলে একেবারে বদলে গেল ! এত সাহস ওরা পেল কোথায় ? গুলী তো আরও অনেকবার এখানে-ওখানে চলেছে, তবে এবারে এমন হলো কেন ? কিছুতেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

: এখন কি করা যায় স্যার ? একটা সিগারেট ধরিয়ে খয়রাত হোসেন সাহেব কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন।

: হু—উ—। হ্যাঁ।

খয়রাত হোসেন সাহেব অবাক হয়ে গেলেন জহির সাহেবের গুম-হয়ে-যাওয়া মূর্তি দেখে। জহির সাহেবের নাম শুনলে এখনো অনেকের বুকে কাঁপুনি ধরে। এখনো অনেকের মুখ শুকিয়ে যায়— ভয়ে আর আতঙ্কে। আব একি অবস্থা জহির সাহেবের।

: স্যার !

: স্কাউনড্রেলস ! ভেবেছে জহির সাহেব ভয় পেয়েছে। ওদের হুমকিতে ভয় পাব আমি ! হুঁ ! দাঁড়ান না। মুভমেণ্টটা একটু থামুক, তারপর কেমন কবে চাঁইগুলোকে একটা একটা করে শায়েস্তা করি !

জহির সাহেব উত্তেজনায় দুম করে একটা ঘুষি মারলেন টেবিলে। কেঁপে উঠল টেবিলটা। সঙ্গে সঙ্গে খয়রাত হোসেন সাহেবও ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেলেন। নিশ্চল। নিশ্চল সব কিছু। বাইরে গার্ডের বুটের খট খট শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে। জহির সাহেব আবার কি যেন ভাবছেন। খয়রাত হোসেন সাহেব টেবিলের উপরে পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

: হ্যাঁ ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করুন। তারপর কানে কানে কি যেন বললেন।

জহির সাহেবের কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারলেন না খয়রাত হোসেন সাহেব।

: লিফলেট! কিসের লিফলেট স্যার?

: উর্দু'ওয়ালাদের গালাগাল দিয়ে লিফলেট। আর কাল তো হরতাল, না? হয়তো তাদের অনেকের দোকান-পাট বন্ধ করবে না। তার মাঝে লিফলেটগুলো কাজ দেবে। গোলমাল লেগে উঠলেই ওয়ান-ফরটি-ফোর—ব্যাস। আর মোহাজেঁর সমিতির রসিদ সাহেবকে বলবেন, আমার সঙ্গে আজ রাতেই যেন দেখা করেন। আর আই. বি. হায়দর খানকেও কাল কাজে লাগিয়ে দেবেন।

: আচ্ছা স্যার তাই করব। আমি যাই তা'হলে। শহরটা একবার ঘুরে আসি।

খয়রাত হোসেন সাহেবের পদধ্বনি মিলিয়ে গেল। জহির সাহেব আরামে নড়েচড়ে বসলেন চেয়ারটাতে। ধু ধু মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে এতক্ষণে জহির সাহেব যেন ওয়েসিসের সন্ধান পেয়েছেন। ফাইভ-ফিফটি-ফাইভের টিন্ থেকে একটা সিগারেট তুলে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজলেন। তারপর সিগারেটটা জ্বালিয়ে আরামে চোখ বুঁজে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। আঃ—হ!

চব্বিশে ফেব্রুয়ারী।

আজকের দিনটা যেন অন্যান্য দিনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কাল বৈশাখীর মত মানুষের মনে জমেছে বিক্ষোভের মেঘ। বোবা হয়ে গেছে সমস্ত শহরটা। পিচঢালা রাস্তাগুলো গাড়ী-ঘোড়া আর মানুষের নিপীড়ন থেকে রেহাই পেয়ে যেন পরম আরামে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। শুধু দু'একটা পুলিশ-ভ্যান ঘুরছে এদিক-ওদিক। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে—পাথরের মূর্তির মত। রাইফেলের সঙ্গীনগুলো চক চক করছে রৌদ্রালোকে। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত ও কলকারখানা—

সব বন্ধ। চাকা বন্ধ। একদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে শহরের গতি।

জহির সাহেব ফোন হাতে বসে আছেন অফিসে। ছোট্ট এক টুকরো খবরের জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছেন তিনি। যেমনি করে বাসর রাতে দুলহা দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করে দুলহীনের জন্য ঠিক তেমনি বসে আছেন জহির সাহেব। একটা খবরের মধ্যেই যেন মরণকাঠি আর জীয়ন-কাঠি দুইই লুকিয়ে আছে। লিফ্‌লেট ছড়ান হয়েছে সকালে। গুণ্ডা আর আই. বি-রাও শহরের অলিতে-গলিতে বেরিয়ে পড়েছে। খয়রাত হোসেন সাহেব বেরিয়ে গেছেন গাড়ী নিয়ে। ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—এসেছে! খবর এসেছে! আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন জহির সাহেব।

: হ্যালো কে? খয়রাত হোসেন, কি খবর বলুন।

: কমিউনিষ্ট বলে সাত-আটটি ছোকরাকে এ্যারেষ্ট করেছি স্যার।

: এ্যারেষ্ট করেছেন। কিন্তু তাতে কি হবে?

: পিপল্‌-সেন্টিমেণ্টকে একটু ঘুরিয়ে দিলে কাজ হবে স্যার।

: আচ্ছা, ঠিক আছে। অবস্থা কি রকম বুঝছেন?

: ভালোই।

: আচ্ছা আমি অন্যদিকে বেরিয়ে পড়ি স্যার।

জহির সাহেব ছেড়ে দিলেন ফোনটা। আশার আলো দেখতে পেয়ে জহির সাহেবের মাথাটা হাল্‌কা লাগছে অনেকটা।

খয়রাত হোসেন সাহেব গাড়ীটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শহরের বুকে। এদিক-ওদিক সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছেন খয়রাত হোসেন সাহেব। রাস্তার লোকগুলো পুলিশের গাড়ীটা দেখতে পেয়ে কেমন যেন মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। খয়রাত হোসেন সাহেব সবই দেখছেন ও বুঝতে পারছেন সবই। গাড়ীটা এগিয়ে চলল শহরের আঁকা-বাঁকা

পথ ধরে। কোথাও কিছু নেই। নিশ্চল। নিশ্চুপ সব কিছু। মনে হয়, সূচ পড়ার শব্দও হয়তো শোনা যাবে। ভাড়া করা গুণ্ডাগুলো অপদার্থের একশেষ। কী করছে এতক্ষণ! একটা গোলমাল লাগছে না! আই. বি-গুলোও ভবঘুরের মত ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। খয়রাত হোসেন সাহেবের মেজাজটা বিগড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। গাড়ীটা খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই খয়রাত হোসেন সাহেব যা দেখলেন, তাতে থমকে গেলেন। গভীর সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে যেন পারের সন্ধান তিনি পেয়েছেন।

: রোক্‌কে ড্রাইভার।

ক্যাচ—চ—চ। আর্তনাদ করে গাড়ীটা থেমে গেল। রাস্তার পাশের দোকানটার সামনে অনেকগুলো লোক জমায়েত হয়েছে। উত্তেজিত কণ্ঠের টুকরো টুকরো কথাও ভেসে আসছে বাতাসে। ওই তো আই. বি. হায়দর খানকে দেখা যাচ্ছে। হায়দার খান হাত পা নেড়ে কী যেন বলছে লোকগুলোকে। আশেপাশের লোকগুলো রেসের ঘোড়ার মত পা ঠুকছে, ছেড়ে দিলেই ছুটে বেরিয়ে যাবে। খয়রাত হোসেন সাহেব কাকে যেন দেখতে পেয়ে চোখের ইঙ্গিতে কাছে আসতে বললেন।

লোকটা এগিয়ে এল।

: কী হালচাল ছামাদ ?

: ঠিক আছে স্যার। সবাই ক্ষেপে গেছে।

: বহুত আচ্ছা।

খুশীতে ফুলে উঠলেন খয়রাত হোসেন সাহেব। হৃদপিণ্ডটা আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠছে বারে বারে।

: আমি অফিসের দিকে যাচ্ছি। তোমরা এদিক সামলাও।

আচ্ছা স্যার।

গাড়ী হাঁকিয়ে অফিসের দিকে চললেন খয়রাত হোসেন সাহেব। এবারে যেন তিনি হাওয়ায় ভর করে চলেছেন—এত হাল্‌কা লাগছে নিজেকে!

দোকানটার সামনে চেঁচামেচি হচ্ছে, শালা আমাদের দেশে এসে আমাদেরই খাবে আর আমাদের কথামত কাজ করবে না।

ঃ ঠিক বলেছ ভাই। কে যেন কথাটা বলল।

ঃ এই শালা! দোকান বন্ধ কর।

দোকানী লোকটা ভয় পেয়েছে কিছুটা। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। মরতে হয় সেও ভালো, তবুও কিছুতেই দোকান সে বন্ধ করতে পারবে না। গতকাল রাত্রে মোহাজের সমিতির রশিদ আহমদ সাহেব যা বলেছেন তা শুনে দোকান বন্ধ করা যায় না। বাঙলা মুলুক বলে কোন বাত নেই—সব এক আছে। রশিদ সাহেবের কথাগুলো এখনো দোকানীর কানে যেন বাজছে। মরতে হয় সেও ভালো, তবুও সে দোকান বন্ধ করবে না।

ঃ এই শালা! দোকান বন্ধ করবি কি না, বল?

ঃ নেহি।

ঃ আরে শালার তেজ দেখ না।

স্বেচ্ছাসেবকদের খালি ট্রাকটা চালিয়ে যাচ্ছিল হামিদ। লোকজন আর গোলমাল দেখে ট্রাকটা থামিয়ে নেমে পড়ল সে। ট্রাক ক্লিনার হাফিজকে বলল হামিদ, গাড়ীটা দেখিস রে ব্যাটা। হামিদ কথাবার্তা শুনেই বুঝতে পারলো কোথা থেকে কি হচ্ছে। কোথাকার পানি কোথায় যাচ্ছে গড়িয়ে। কলকাতার ছেলে হামিদ। বস্তিতে আর কারখানায় কাটিয়েছে জীবনের অনেকগুলো বছর। অনেক দেখেছে, অনেক জেনেছে সে। দেখেছে কি করে দাঙ্গা লাগিয়ে দালালরা

ধর্মঘট বানচাল করে দেয়। সবই দেখেছে সে। দুঃখের মধ্যে দুঃখ, সেই সাধের কলকাতা ছাড়তে হয়েছে। আর কলকাতাও ওর ঘর নয়, ঘর তো পাঞ্জাব না কোথায় যেন। তবে বাড়ী ঘর নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না হামিদ। জিধার রাত উধার কাত অর্থাৎ যেখানেই রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়। হায়দর খানের উঁচু গলা শুনেই বুঝতে পারলো সে দলের আসল ঘুঘু কে। হামিদ আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেল। দোকানীর হাতটা হঠাৎ চেপে ধরে হামিদ বলল,

ঃ এ ভাইয়া আল্লাহকাবাস্তে দোকান বন্ধ কর দে। আরে ভাই ইয়ে লোগকা বাত মান লে।

ঃ নেহি, লোকটা গর্জে উঠল আবার।

নেহি? মুহূর্তে হামিদের দেহের রক্ত ফুটে উঠল টগবগ করে। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে রেখে আবার বলল হামিদ,
ঃ ভাই তুম ভি মোহাজের, হাম ভি মোহাজের হ্যায়। হামলোগকা ঘর তো এহি মুলুক হোগা। এহি মুলুকমে হাম রহেঙ্গে আওর বোলেঙ্গে উর্দ্দু জবান—ইয়ে ক্যায়সি বাত হ্যায়? উর্দ্দু তো ওলোগ বলেগা যেসকা ঘর বাঙলা মুলুককা বাহার হ্যায়? আগার তুম উর্দ্দু বোলনে মাংগতা হ্যায় তব বলো, কোই নেহি রোকেগা। আব দোকান বন্ধ কর দে ভাই।

মানুষের ভীড় ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে উত্তেজিত কণ্ঠের কথাবার্তা।

ঃ দেখছেন কী? দোকান বন্ধ করবে না—ইয়ার্কি পেয়েছে?

ঃ মার শালাকে।

অনেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল। স্বেচ্ছাসেবক যারা এসেছে, তারাও ক্রুদ্ধ সাপের মত উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে পারছেন না। ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে অনেকেই। জনতার গর্জনকে ছাপিয়ে আর একটি গর্জন ভেসে উঠল বাতাসে। মিছিলের গর্জন। দূরে একটা

মিছিল এগিয়ে আসছে। হামিদ বুঝতে পারছে, কোথায় এর শেষ। মিছিল যদি এসে পড়ে, তাহলে সবই ওলটপালট হয়ে যাবে। মিছিলের লোকগুলো দোকান খোলা দেখলেই একটা গোলমাল লেগে যেতে পারে। ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে দোকানীর ঘাড়ে, নয়তো দোকানটা ভেঙ্গে দেবে। গোলমাল যদি লেগে যায়, তবে যে কত বড় ক্ষতি হবে তা, তখন আর কেউ ভেবে দেখবে না। হামিদ কথা-গুলো চিন্তা করে মুষড়ে পড়ল। তবুও হাল ছাড়লে তো চলবে না। রাস্তা তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। হামিদ হঠাৎ একটা অভাবনীয় কাজ করে বসল। অকস্মাৎ সে চেপে ধরল দোকানীর পা দুটো।

ঃ এ ভাই! আভি আল্লাহকাবাস্তে দোকান বন্‌ধ কর দে। জল্‌দি বন্‌ধ কর ভাই।

দোকানী, লোকটাকে হঠাৎ পায়ে ধরতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সাময়িকভাবে। উপস্থিত লোকগুলো কিছুই বুঝতে না পেরে হা' করে রইল। শুধু হায়দর খানের মুখটা মুহূর্তে ছাই রঙা হয়ে গেল। দোকানীও যেন কতক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল,

ঃ আচ্ছা হাম দোকান বন্‌ধ কর দেতা হ্যায়।

ঃ এহি তো চাহতা হ্যায়। সাবাস ভাই।

হামিদ, সফলতা ও বিপদ কেটে যাওয়ার আনন্দে বুকে চেপে ধরল দোকানীকে। দোকানটা বন্ধ হয়ে গেল কতক্ষণ পরেই। হামিদ এবার খুঁজতে লাগল হায়দর খানকে। অবস্থা বেগতিক দেখে গুটি গুটি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিল হায়দর খান। হামিদ হঠাৎ খপ করে চেপে ধরল ওর সার্টের কলারটা।

ঃ শালা হারামী ভাগতা কাঁহা?

মোটরের ষ্টিয়ারিং-ধরা শক্ত হাতের একটা ঘুষি এসে পড়ল হায়দর খানের নাকে। হায়দর পড়তে পড়তে সামলে নিল নিজেকে। ঘুষির পর ঘুষি চলল। খানিক পরে চেনবার জো রইল না হায়দর

খানকে। ওর নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে গল গল করে। অনেকেই বুঝতে পারল না কি হয়েছে। সবার চোখে-মুখে ব্যাপারটা জানবার আকুল আগ্রহ উপচে পড়ছে। কেউ কেউ আবার থামিয়ে দিতে চেষ্টা করল হামিদকে।

: কি হয়েছে ভাই, ওকে মারলে কেন? কে যেন জিজ্ঞাসা করল হামিদকে।

হামিদ পকেট থেকে ছেঁড়া ময়লা রুমালটা বের করে রক্তাক্ত হাতটা মুছতে মুছতে জবাব দিল,

: শালা দালাল আছে ভাই।

: গোলমাল লাগাতে এসেছিল।

: দালাল! অনেকের মুখ দিয়ে একসংগে কথাটা বেরুল।

: কোথায় গেল শালা?

কোথায় হায়দর খান? চিহ্নও নেই। সুযোগ বুঝে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে ছুটেছে সে তার অফিসের দিকে।

ওদিকে রাইফেলধারী পুলিশ নিয়ে দ্রুতগতিতে গাড়ী হাঁকিয়ে আসছেন খয়রাত হোসেন সাহেব আর জহির সাহেব। প্রয়োজন হলে ফাঁকা আওয়াজ। তারপর ওয়ান-ফরটি-ফোর। জহির সাহেবের অন্তর-আকাশে এ মুহূর্তে উড সাহেবের কথাই ভেসে উঠছে। ধন্য উড সাহেব। ধন্য তোমার বুদ্ধি!

: স্যার!

খয়রাত হোসেন সাহেব আঁতকে চীৎকার করে উঠলেন। খয়রাত হোসেন সাহেব যা দেখলেন, তাতে মাথা ঘুরে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন নিজেকে। খয়রাত হোসেন সাহেবের আঁতকে ওঠা চীৎকারে চম্‌কে উঠলেন জহির সাহেব।

: কি হল?

খয়রাত হোসেন সাহেব বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন, কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু আঙ্গুল দিয়ে কি যেন দেখিয়ে দিলেন।

জহির সাহেব দেখলেন। হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ধপ করে থেমে গেল, কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আহত ও বিকৃত চেহারা নিয়ে টলতে টলতে হায়দর খান হাত তুলেছে গাড়ীর সামনে। গাড়ী থামলো। জহির সাহেব সামলে নিলেন সাময়িক ধাক্কাটা।

: কি হয়েছে হায়দর ?

: কিছু না। শুধু মার খাওয়াই সম্বল হল—স্যার!

মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠলেন জহির সাহেব!

: মার খাওয়া ? হুঃ।

: আচ্ছা আমিও দেখে নেব ওদের। নাও গাড়ীতে উঠে পড়...।

কথাটা শেষ করতে পারলেন না জহির সাহেব। মিছিলের চীৎকারে তাঁর কথাটা বুদবুদের মত মিলিয়ে গেল। দূরের মিছিলটা কাছে এসে গেছে এতক্ষণে। থেমে থেমে মিছিলের চীৎকার ভেসে আসছে বাতাসে। সে চীৎকার যেন উন্মত্ত সমুদ্রের গর্জনের মত শোনাচ্ছে। জহির সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে রইলেন চলন্ত মিছিলটার দিকে।

অগ্নিবাক

আতোয়ার রহমান

মা

মনটা যেন নিজের ব্যথার ভারে নিজেই আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কান্না আপন ক্লান্তিতে যতি দিয়েছে আবার পূর্ণোদ্যমে নামবার জন্যে। যেন বর্ষণ-ক্লান্ত শ্রাবণের আকাশ নিজেরই বুক আর চোখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আকাশের রঙ এখন ইঁদুরের গায়ের মতো ধূসর। যতির আলোকে আকাশ আবার বর্ষণ অন্ধকার-মুক্ত পৃথিবীকে দেখতে পায়।

মণি আবার বাস্তব হয়ে ওঠে। মুখখানায় অপার তৃপ্তির আভাস। যেন মেহনতী বুভুক্ষুর ভাগ্যে ভর পেট আহার জুটেছে। কিন্তু এ-তৃপ্তি নতুন নয়, ওর বয়েসেরই মতন প্রাচীন, পূর্ণ একুশ বছরের। এবং একান্তই বাহ্যিক। ওর ওই তৃপ্তির আড়ালে দুর্মর এক চঞ্চল পিপাসা আত্মগোপন করে থাকে। সময় পেলেই সেই পিপাসা বেরিয়ে পড়ে উদগ্র হয়ে।

তিন বছর আগের কথাও নয়। ওরা তখন সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার ঘৃণার দহন থেকে—মানুষের ঘৃণার দহন থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে পাকিস্তানে আশ্রয় নেয়। উলুবেড়ে থেকে বেরোবার আগে মণি বললো, মা, জীবনে আর কিছু চাইনে। শুধু একবার এখান থেকে চলো।

দুঃখের মধ্যেও মা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন, তোর মতো খঞ্জনীরলেজ ছেলে এতো অল্পেই শান্ত হবে?

: বিশ্বাস করো মা। ঢাকায় পৌঁছে অষ্টপ্রহর যদি তোমার কোলে বসে না থাকি তো আমি .....

মা হাসলেন।

কিন্তু ঢাকায় এসে চোখ মুছলেন। ছেলে দু'দণ্ড ঘরে দাঁড়ায় না। কোনোক্রমে চারটি ভাত মুখে দিয়ে পথে গিয়ে কুলি ফেলে। তারপর খালি হৈ হৈ রৈ রৈ, ক্লাব-লাইব্রেরী, সভা-সমিতি আরো কতো কি।

মা তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁরে, জীবনের ওপর কি তোর একটুও মায়া নেই। সারাটা দিন তো অমন করে বেড়াস।

মণি হাসে, মায়া আছে বলেই তো অমন করি। মরতে তো আর চাইনে। পৃথিবীটা কতো সুন্দর, দেখো তো! তাছাড়া, নতুন জায়গায় এসেছি। ঘুরে-ফিরে সব জেনে নেব না?

তারপর একটুখানি থেমে গলাটা ভারী করে বলে, জানো মা, গরীবের অবস্থা সব জায়গায়ই সমান। মোহাজেরদের উলুবেড়েতে যেমন দেখেছি, এখানেও তেমনি। বড়োলোকেরা নিজেদের স্বার্থ বাঁচাবার জন্যে দাঙ্গা বাধিয়ে আমাদের ভোগাল। আরো কতো কি করবে, কে জানে!

কলেজে ঢুকে মণি কি সব নতুন কথা বলতে শিখেছে। কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আনন্দে মা চুপ করে থাকেন। সব কথা তিনি বোঝেন না। দারিদ্র্যের সূত্র ধরে বলেন, গরীব শুধু বাইরেই দেখিস। ঘরে দেখিসনে!

ঃ দেখিই তো! তাই বলে কি আমায় রাজা হতে হবে, মা? ওতে আমার সাধ নেই!

ঃ শোনো ছেলের কথা। রাজা হতে কে বলছে! দশজনে যেমন চলে, তুইও তেমনি চলবি।

ঃ দশজন। ঠিক বলেছো। তা না হলে তুমি আমার মা? মণি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে নাচতে থাকে।

মায়ের ভাবনা মেটে না।

টানাটানির সংসার। শুধু আজকে নয়, জন্মাবধি। উলুবেড়েতে মণির বাবা ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির কেরানী। নামেমাত্র একটা ভদ্রাসন ছিলো শহরের একান্তে। সম্পত্তির মধ্যে ওইটুকুই। হাতের পাঁচ গয়নাগাটি যুদ্ধের আমলেই শেষ হয়ে গিয়েছিলো। মা, বাবা, মণি, মিনা আর রেবা পাঁচটি মানুষের খরচান্তিক সংসারের দিকে চেয়ে বাবা তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় থমকে যাওয়া কঙ্কালসার মানুষ তিনি। তাঁর নিঃশ্বাস শুনে মা চম্‌কে উঠে বলেছিলেন, এতোও ছিলো আমাদের বরাতে!

বাবা সামলে নিয়েছিলেন তক্ষুণি, নাহ, কি আবার থাকবে বরাতে! তারপর পাঠরত মণির দিকে চেয়ে বলেছিলেন, কোনো ভয় নেই আমার। মণি আছে যে......

মণি আছে। বছরের পর বছর ওর বয়েস বেড়েছে, আর এই কথা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরো করে শুনেছে ও। ক্রমবোধ্য কোনো কথার মতো তার অর্থটাও ক্রমশঃ গভীর এবং ব্যাপক হয়ে উঠেছে ওর মনে। বোধ হয়, সে জন্যেই বাবা যখন এখানে এসে আবার চাকরীর খোঁজ করলেন, তখন ও বললো থাক, আব্বা, এবার আমিই একটা কিছু করি।

বাবা বলেছিলেন, কি করবি?

মা কথা এগোতে দেননি! মিনা আর রাবেয়ার দিকে চেয়ে বাবাকে বলেছিলেন, যাদের জন্যে ও পড়াশোনা ছেড়ে চাকরী করতে চায়, এখন পড়াশোনা ছাড়লে যে তাদের কোনো গতিই হবে না।

মিতবাক বাবা এক দোকানে ম্যানেজারির চাকরী নিলেন।

মণি তারপর আবার যে কে সেই। মা এক সময় তাই নিয়ে অনুযোগ করেছিলেন। কিন্তু, মণি, মা এখন মনে মনে বলেন,—তোকে আমি ভুল বুঝেছিলাম, বাবা। তুই যে ছেলে মানুষ। সংসারের জ্বালা না হয় বুঝিসই। কিন্তু তোর যে আনন্দ করবারও বয়েস! আর চাকরী তো আমরাই করতে দিলাম না। তোর কি

দোষ? কিন্তু—কিন্তু তুই ভুল ভাঙবার সময় দিলিনে কেন, বাবা? ছেলে মানুষ তোকে—

ছেলে মানুষ। ছেলে। চঞ্চল। মায়ের মন চলে যায় আর এক জগতে। তাঁর তখনো বিয়ে হয়নি! ঠিক গরীব ঘরের মেয়ে তিনি নন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন শুধু ছ'টি বোন,—তিনি সবার ছোটো,—পাঁচ মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর বাবা উৎসাহ এবং অর্থ, দুটোতেই প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যান। এদিকে তাঁর বয়েস বেড়ে চললো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আবহাওয়ার মধ্যে। তাঁর মনে তখন স্বপ্ন দেখা দিতো ভেজা চুলের সসঙ্কোচ গন্ধের মতো। বড়ো চার বোনের ছেলেমেয়ে মাঝে মাঝে নানার বাড়ী আসতো উজ্জ্বল এক একটা খঞ্জনীর মতো। মা তাদের কল্পনা করতেন নিজের ছেলে বলে। মনে মনে বলতেন, আল্লা, আমার যেন কোল ভরে ছেলে আসে। কোল ভরা চঞ্চল ছেলে! আর, মোটে একটা মেয়ে। বেশী মেয়ে দিয়ে আমায় আর কষ্ট দিয়ো না।

ছেলে এলো। কিন্তু একটি! আর, দুটি মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছেলের নাক-চোখ-চুল একেবারে ওর বাবার মতো। পার্থক্য শুধু ওর ওই তৃপ্তির ছাপে। বাবার মুখ গম্ভীর। কিন্তু চঞ্চল ছেলে। খেলো তা খেলো, না হয় খেলোই না। ছুটে চলে গেল খেলতে। অজস্র ওর খেলার সাথী। ওরই মতো চঞ্চল। ছোটো বেলায় মাঝে মাঝে ওর সঙ্গীদের কোলে নিতেন মা। ভারী সাধ হত, সবাই তাঁকে মা বলে ডাকুক। পীড়াপীড়ি করতেন। কিন্তু ছেলেরা লজ্জায় মুখ লুকোতো। এই অভ্যেস তাঁর আজও যায়নি। এখানে আসার পর মণির ঘনিষ্ঠতম বন্ধু জুটলো ইউসুফ! ভারী মিষ্টি ছেলে। মা কতোদিন তাকে বলেছেন, বাবা, তুই আমায় মা বলে ডাকিসনে কেন? মণি আর তুই কি আলাদা?

শুনে মণি ঠাট্টা করে, এক ছেলেতে তোমার মন ভরে না। তাই না মা? আর, আমি বুঝি খারাপ! তাই, আমার রাজ্য ভেঙে

টুকরো টুকরো করে দিতেও চাও। তা ডাক, ইম্নু। তাতেও আমার লাভ। ভাই পাবো।

মা মিনা আর রেবার দিকে চেয়ে নিয়ে শুধু হাসলেন।

মণি বলে, বুঝলি মিনা-রেবা, মা তোদের দেখতে পারে না। কিন্তু আমি তোদের দলে। আমি তোদের প্রফেসর করে দেব। বলেই এক টান মারে রেবার বেণী ধরে, মিনাকে কাটে চিমটি। দুজনেই কেঁদে ওঠে।

মণি তাড়াতাড়ি ওদের কোলের কাছে টেনে নেয়, আরে রে রে রে কাঁদিসনে, কাঁদিসনে। খেলনা আর গল্পের বই আনতে যাচ্ছি যে।

অমনি কান্না থেমে যায় ওদের। মেয়ে দুটি এমন নেউটে ওর। ভাইয়ের হাজার খুন মাপ ওদের কাছে। ও-ও তেমনি আদর দিয়ে মাথায় তোলে।

কিন্তু প্রফেসরি! মণির সখ, প্রফেসর হবে। অথচ কেন জানি, বাবা কথাটা শুনতে পারেন না! মণিও তাঁর সামনে কিছু বলে না। কোনো দিনই কিছু বলেনি ও বাবাকে। তাঁকে কেমন যেন এড়িয়ে চলতো, যদিও তিনি ওকে কোনো দিন কিছু বলেন নি। মণির তবু ভয় কাটে না। বিয়ে হয়ে গেল, তবুও না।

বিয়ে হয়ে গেছে। ওই যে বৌমা। হঠাৎ যেন বুকের ভেতর স্ূচ ফুটলো। সকাল বেলার একটা কথা মনে পড়লো মায়ের। ধারা শ্রাবণের যতি ফুরিয়ে গেল—আমার কথা ও কখনো শোনেনি। আমিই না হয় পারলাম না। আমার বারণ ও শুনলো না। এক্ষুণি আসছি বলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু তুমি? তোমার তো সবই ভালো, বৌমা—

বধূ

সকল কথা ও শুনতো। অথচ আজকে শুনলো না। শোনাটাই

যেন সম্ভবও হয়নি। সেই কথাটাই হেমন্তের গাঁও-ঘেরা কুয়াশার মতো মাহ্‌বুবার মনটা ঘিরে থাকে।

সকাল বেলা শাশুড়ী বলেছিলেন, দেখো, বোমা, ওকে যেন বেরোতে দিয়ো না এর মধ্যে। এতোদিন পারো নি। আজকে একটু দেখে-শুনে রেখো।

স্বামী যেন আঁচলে বেঁধে রাখবার জিনিস।

কিন্তু মিথ্যেই বা কি এমন সে-কথা?

সাত-সকালে গোসল সেরে দু'হাতে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে মণি ঘরে এসে ঢুকলো। যেন গাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে, এমনি ব্যস্ত-সমস্ত ভাব দেখিয়ে বললো, শীগ্‌গীর চিরুণী দাও।

মাহ্‌বুবা শুধু বললো, না।

মুখ তুলে তাকিয়ে মণি হেসে ফেললো, সে কি গো, সোয়ামীর কথা শুনলে না। গোনা হবে যে, কবিরা গোনা! মাহ্‌বুবা উঠে দাঁড়ালো। না, হাসির কথা নয়। জানো, আজ সকালে কতোবার ধমক খেয়েছি মার কাছে?

ঃ তা ধমক খাওয়ার কাজ করলে খাবেই তো।

ঃ খাবোই তো! চৌদ্দোশো বার বলে বলেও তোমায় ঘরমুখো করা গেল না। কিছুতেই কথা শুনবে না তুমি। এখন মা খোঁটা দেন, এ আবার কেমন বউ?

মণি মুখ গম্ভীর করে বললো, তাই তো বউ-মানুষের পক্ষে এ তো ভারী অপযশের কথা।

ঃ আবার ফাজলেমি? চললাম আমি।

মণি অস্ত্র ছাড়লো। প্রায় হাঁক দিয়ে উঠলো, যেয়ো না প্রিয়ে—

মাহ্‌বুবা ছুটে এসে মণির মুখ চেপে ধরলো, দোহাই তোমার।

ওই এক ভয় মাহ্‌বুবার। মণি যেখানে-সেখানে নামটার বাংলা করে ডাকে প্রিয়া বলে। মাহ্‌বুবা কতোদিন প্রতিবাদ করেছে, এ আবার কি খেয়াল তোমার?

ঃ 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে 'কি আশা ?' ডার্লিং শুনতে যতোই মিষ্টি হোক, 'লক্ষ্মী'র কাছে হার মানে।

ঃ নাঃ নামটা রাখাই ভুল হয়েছে বাপ-মায়ের। অন্য কিছু রাখা উচিত ছিলো।

ঃ আজিজা, মাশুকা, হাওয়া, পিয়ারী, লাইলী,—এই সব ছাড়া। সব কটার মানে প্রিয়া।

ঃ আমি হলে ওসব নাম রাখতাম না।

ঃ পাগল! তা কেন রাখবে ? অতো নামের বোঝা কে বইবে ? সোজা বাংলা অর্থটাই রেখে দিতে।

ঃ আর পথে-ঘাটে সবাই 'প্রিয়া' 'প্রিয়া' করে ডাকতো। মরে যাই বুদ্ধি দেখে!

মণি হার মেনেছে। বলেছে, না, তুমি শুধু আমার প্রিয়া। আমার। আমি ভালোবাসতে চাই তোমায়। বাঁচতে চাই তোমার ভালোবাসা নিয়ে।

ঃ কিন্তু ফের যদি অমন করো, আমি গলায় দড়ি দেব।

আজও মাহ্‌বুবা ভয় দেখালো।

মণি বললো, কখ্‌খনো না।

ঃ বেশ, তাহলে বেরিয়োনা আজ।

মণি গম্ভীর মুখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তোমার 'ভাষাকে' তুমি ভালোবাসো না!

ঃ দেখো সবই বুঝি। কিন্তু মাব গাল শুনতে হয় যে! আর আমার মনই কি মানতে চায়! অন্ততঃ আজকে আমার কথাটা শোনো।

ঃ ভয় ? ভয় কি শুধু আমারই জন্যে ? যদি অন্যে সইতে পারে, তুমি পারবে না এই দেশেরই মেয়ে ? তুমিও না সে দিনও ছাত্রী ছিলে ?

ঃ তুমি যদি পারো আমিও পারি।

মণি হেসে ফেললো, এ তো হল বউয়ের কথা। সহধর্মিণী কিংবা সমধর্মিণী আর হতে পারলে না।

মাহ্‌বুবা একেবারে বুক ঘেঁষে দাঁড়ালো, সে তুমি আমায় বানিয়ে নিয়ো। কিন্তু আজকে অন্ততঃ আমার কথাটা রাখো। আমার মনের যা হয়, হোক! মার কাছে আর গাল খাইয়ো না।

ঃ আচ্ছা, আচ্ছা, আমি মাকেই বলে যাবো। তোমার আর খোঁটা শুনতে হবে না তাহলে।

খোটা।

মণির বাবার বন্ধুর মেয়ে মাহ্‌বুবা। দুই বন্ধুতে কথা ছিলো সেই ছাত্রজীবন থেকে। মাহ্‌বুবার বাবা সরকারী চাকুরে, আগেই এসে জুটেছিলেন এদেশে। মণিদের আসার পর পড়লেন শক্ত অসুখে। বন্ধুকে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার আমানত এবার আপন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, ভাই।' আমি শান্তিতে চোক বুঁজি।

পরদিনই মাহ্‌বুবার গায়ে হলুদের ছোপ পড়লো। বাবা বিদায় নিলেন কয়েকদিন পরেই। শুধু বলে গেলেন, আমার প্রথম সন্তান আদুরে। তোমারও তাই, বেয়াই। কি করে ওদের রাখতে হয়, তা তুমি ভালো করেই জানো।...

আদরেই ছিল মাহ্‌বুবা। শুধু মণির চাঞ্চল্য বন্ধ হল না বলে শাশুড়ী মাঝে মাঝে রাগ করতেন, এ আবার কেমন বউ? সোয়ামীকে কথা শোনাতে পারে না।

বেশী রাগ হলে বলেন, ও মেয়ে জানে, বন্ধুত্বের একরারের দায়ে ওকে ঘরে আনা হয়েছে। কেউ ওকে ঠেলতে বা ফেলতে পারবে না। সেইজন্যেই তো ও আমার ছেলেকে অমন অবহেলা করে।

অবহেলা!

কিন্তু বিয়ে যখন হল, তখন কতোটুকুই বা ছিলো ও? সবে

কৈশোর পেরোচ্ছে তখন। লজ্জাটা তখনও ঘন মধুর হয়ে ওঠেনি, স্বামীর মর্ম ধরা দেয়নি মনের কাছে। এজেনের বিষয় তো প্রায় না বুঝে-সুঝেই 'হু' বলে ফেলেছিলো। বিয়ের পর মাঝে-সাঝে খেলতেই বসে যেত মিনা আর রেবার সাথে।

একদিন—

রেবার সেদিন দাঁত পড়েছে একটা। মাহ্‌বুবা বললো, দাঁড়া ইঁদুরের গর্তে ফেলবি। ছোটো দাঁত উঠবে তাহলে। মণিরই বা কতো বয়েস? সেও এসে জুটলো।

চললো ইঁদুরের গর্ত খোঁজা।

একটা পাওয়া গেল। হোক, না হোক, সবাই রায় দিলো এইটিই ইঁদুরেব গর্ত। মাহ্‌বুবা বললো, রেবা বল—ইঁদুব, ইঁদুর, আমার দাঁত নিয়ে যা, তোর দাঁত দিযে যা, তোর দাঁত দিয়ে যা— তিনবার বলে দাঁত ছেড়ে দিবি।

ঠিক এমনি সময়ে শাশুড়ী হাঁকলেন, বৌমা! বয়েস কি বাড়ছে, না কমছে? সোয়ামীর সামনে খেলা!

লজ্জায় মরে গিয়েছিলো মাহ্‌বুবা। তারপর এক সময় মণির কোলে মুখ লুকিয়ে কি কান্না!

মণি হাত বুলিয়ে দিয়েছিলো গায়ে, আমি তো বকিনি! মাও তোমায় ভুল বুঝছেন! মাঝে মাঝে খেলারও দরকার আছে বৈকি! আমি মাকে বলে দেব।

মাহ্‌বুবা স্বামীকে বোধ হয় সেই দিনই প্রথম চিনেছিলো। তারপর শুরু হল ভালো করে চেনা।

সে চেনা কি শেষ হয়েছিলো? সে চেনা-জানা পাকা-পোক্ত হবে যাকে দিয়ে, তার যে পৃথিবীতে আসতে এখনও ছ'মাস বাকী!

আর খোঁটা?

ঘরে রাখতে মাহ্‌বুবাই না হয় পারলো না। ক্ষমতা নেই দায়ে পড়ে আনা বউয়ের! কিন্তু না, এই অমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু?

বন্ধু। লোকে বলতো তাই।

কিন্তু ইউসুফ জানে, তার চেয়েও বেশী! অথচ পুরো ছ'বছরের আলাপও নয়।

ক্লাসের আর দশজন ছেলের সঙ্গে যেমন আলাপ হয়, তেমনি ভাবে আলাপ হয় মণির সাথে, তারপর দেখলো মণি চঞ্চল।

ইউসুফও চঞ্চল।

বন্ধুত্ব হল।

বাড়ীতে দাঁড়াবার অভ্যাস কারোরই নেই! ফাঁক পেলেই তুজন পথে পথে ঘোরে! মণি উলুবেড়ের গল্প বলে, ইউসুফ ত্রিপুরার এক গাঁয়ের। বাংলা দেশের তুই আঞ্চলিক ভাষার গল্প আর ফুরোয় না।

শেষকালে মণি বলে, খাসা তোর 'কিতা কন।'

ইউসুফ বলে, কিন্তু যা-ই বলিস, আঞ্চলিক ভাষায় যতোই তফাৎ থাক, বাংলা ভাষাটাকে আমরা তুজনে সমানই ভালোবাসি।

তুজনেই তা জানি। আটচল্লিশ সালের ভাষা-আন্দোলনের গল্প একদিন ইউসুফই বলেছিলো! কি উৎসাহ তার বলতে। আর, মণি সে তো কথা শুনছিলো না, যেন রসগোল্লা গিলছিলো। শেষে বলেছিলো, উঃ ভাষাটাকে পায়ে ঠেলে ওরা আমাদের সংস্কৃতি-টাকেই খুন করতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে অপমান করে কি করে যে দেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, বুঝিনে। এরই নাম কি বৃহত্তর স্বার্থরক্ষা?

ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের মঙ্গল তো ওরা চায় না। ওরা চায় মুষ্টিমেয়র স্বার্থরক্ষা।

তারপর অনেক দিন কথা হয়েছে এসব নিয়ে। মণি বলেছে, বাংলা দেশটাকে কেউ ভালোবাসে না রে! চোর-জোচ্চররা এদের ভয় করে। তাই নিজেদের দোষ ঢাকবার জন্যে অমনি দাঙ্গা বাধিয়ে

দিলো। আমরা কিন্তু ভালোবাসব দেশকে, আর, আমাদের ভাষাকে। আমাদের ভাষাকে আমরা রাষ্ট্রভাষা করবোই। যতো বাধা আসুক, কিছুতেই থামবো না।

ছেলেমানুষের মতো উক্তি। মণির মুখের সতৃপ্ত ভাবটার দিকে চেয়ে ইউসুফ বলে, তুই পারবিনে। তুই বড়ো আত্মসন্তুষ্ট মানুষ।

মণি হাসে, সে দেখা যাবে। কিন্তু এখানে কোথায় কি হয়, জানা দরকার। তুই আমায় সভা-সমিতিতে নিয়ে যাবি তো? সব জায়গা চিনিনে আমি—

সেই থেকে দুজনেরই বাড়ীতে যাতায়াত।

ইউসুফের অসুখের সময়ে মণি দিনে পাঁচবার করে দেখে গেল। মণির বাড়ীতে গিয়ে মায়ের মুখে ইউসুফ শুনলো, বাঃ, দুটিতে তো বেশ মানিয়েছে! তুমি আমায় মা বলো, বাবা।

ইউসুফ লজ্জায় বাঁচে না! সে লজ্জা ওর কোনো দিন কাটলো না অথচ মণি হয়ে দাঁড়ালো ভাইয়েরও বড়ো। মুখ ফুটে 'মা' না বললে কি মণিকে ভাই বলা যায় না?

মণি কিন্তু মুখ টিপে টিপে হাসে, তুই ভাবিসনি, ইসু। তোকে আমার বেয়াই করে নেব।

ঃ তার মানে? কাঁঠালের গাছেবই দেখা নেই। তুই এদিকে গোঁফে তেলের মেঘনা বইয়ে দিলি?

ঃ কে বলে, দেখা নেই? ঘরের বউটা কি মিথ্যে?

মা আর মাহ্‌বুবার সামনেই বলে। মাহ্‌বুবার লজ্জা দেখে ইউসুফও লজ্জা পায়। বলে, বাঁদর।

মণি বলে, বাঁদর বলে ভালো করলিনে! বেয়াই যখন করতেই হবে। যাকগে, এবার একটা বউ নিয়ে আয় শীগ্‌গীর। নইলে ছেলে-মেয়ের বয়েসের তাল থাকবে না।

পথে বেরিয়ে ইউসুফ বলে, তোর বাবা যা করেছেন, আমাদেরও তাই করতে হবে? এই যুগেও?

ঃ ওটা ভালোই রে,—যদি ছেলেমেয়ে পরে আপত্তি না করে। নিজেকে পল্লবিত করে রাখতে বেশ লাগে।

ঃ তুই ভীরু। ঝড়-ঝাপটার মোকাবেলা করতে তুই কোন দিন পারবিনে।

ঃ কেন ?

ঃ দুনিয়াকে তুই বড্ডো বেশী ভালোবাসিস।

মণি বলে, সেজন্যেই তো পারবো। তুই দেখে নিস।

কালকেও মণি ওই কথাই বলেছিলো। শোভাযাত্রা বেরোবে, পুলিশ বেরোতে দিলো না। মণি বললো, ভালবাসি যাকে, তার জন্যেই তো লড়তে হয়। চ' চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে জেলেই যাই। আজ তারিখ একুশ, আর, আমার বয়েস এখন একুশ। দেখি কোন একুশ জিততে পারে।

ও-ই জিতলো। সকাল বেলাই ধরে নিয়ে গেল। সন্ধ্যের দিকে ফিরে এলো। বললো, মাইল দশেক দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলো।

ঃ তবু জিতেছিস। আমায় তো ধরলোও না।

মণি বললো, না রক্ত গেছে আমার।

ইউসুফ চমকিত হল। লাল লোহার ওপর ঘন ঘন হাতুড়ি পড়লে যেমন শব্দ হয়, তেমনি ভা'বে বেরিয়ে এলো কথাগুলো। গুলী চলেছিলো বিকাল বেলা, তারই প্রতিশব্দের মতো।

আজকেও বেরিয়েছিলো দুজন। এবং শোভাযাত্রার সাথে চলতে চলতে আজকেও শুনলো গুলীর আওয়াজ।

ইউসুফ মণির দিকে তাকিয়ে চকিত হয়ে বললো, শীগ্‌গীর বাড়ী চ'।

কিন্তু বাড়ী এসেই ভুল করলো। হাসপাতালে নিয়ে গেল না, এর ওপর আবার হাঙ্গামা না বাঁধে পুলিশের সাথে, সেই ভয়ে। কিন্তু হাসপাতালে গেলে তো এতো রক্তপাত হত না। এ কাণ্ড

ঘটতো না। মণি,—ইউসুফ হঠাৎ কেঁদে উঠতে চায়,—মণি তুই আমায় ক্ষমা করিসনে। কোনো দিন না।

কিন্তু। বেরোবার সময় ইউসুফ বলেছিলো একটু দেখেশুনে চলিস রে।

মণির চোখ দুটো তখন চৈত্রের চরের মতো রুদ্র হয়ে উঠেছিল, কাপুরুষ।

না, করিস,—মনটা নিমেষে সংযত করে নেয় ইউসুফ—করিস, যখন তোর কাজ শেষ হয়।

সইতে না পেরে বাবা কোথায় সরে রয়েছেন। নিঃসঙ্কোচ ইউসুফ ডাক দিলো, মা, কতোক্ষণ আর বসে থাকবে? মুর্দাকে আজাব দেওয়া হচ্ছে যে! ওকে ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদের আশীর্বাদ করো, ওর কাজ আমরা শেষ কবি।

মা মুখ তুলবেন, চোখ দুটি যেন গঙ্গোত্রী,—কে, কে মা বললি?

ইউসুফ বললো, এখনও কাঁদবে, মা? কিন্তু বলিই বা কি, বাংলা ভাষা আর বাংলা দেশের মা,—দুটোই তো সমান। না খেয়ে খেয়ে তোমরা কি শুধুই কাঁদবে মা?

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে রইলেন মা। শ্রাবণের মেঘ যেন কোন্ মন্ত্রবলে বৈশাখের মেঘে পরিণত হল। শেষে বললেন, না! মণির ভাই বোন কি তাই দেখবে বসে বসে?

আবার একটু নীরবতা। এক হাত ছিলো মাহ্‌বুবার কাঁধের উপর। অন্য হাত বুলিয়ে গেলেন মিনা আর রেবা হয়ে ইউসুফ পর্যন্ত।

মাহ্‌বুবা অস্ফুট স্বরে বললো, আর একজন যে আছে, মা! তোমার ছেলেমেয়েকে ডাকলে। কিন্তু আমার ছেলে?

: তাকেও রে, তাকেও। যে যেখানে আছে, সবাইকে।

আবার বৃষ্টি নামলো।

একুশের নকশা

একটি বেওয়ারিশ ডায়েরীর কয়েকটি পাতা

মূর্তজা বশীর

ফুঁসে ওঠা অজগরের মত বিরাট মিছিলটা কেঁপে কেঁপে আসছে। কালো কালো মাথাগুলো রোদে চক্‌চক্‌ করছে ওর শরীরের আঁশের মতো। সামনে গত কালের শহীদদের রক্তাক্ত কাপড় নিশানের মত ওড়ানো। আরেকজনের কাঁধে একটা টুকরি। অনেকগুলো খালি টিয়ার গ্যাসের খোল দিয়ে তা ভরতি। হাজারো পায়ের তালে রাজপথ উঠেছে নড়ে ; তীরের আছাড় খাওয়া ঢেউয়ের মত খান্‌ খান হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে একটা আওয়াজ : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

মিছিলটা শহরের সদর রেলওয়ে ক্রসিংটার কাছাকাছি আসতেই রাশ টানা ঘোড়ার মত থমকে ওঠে, ক্রসিংটার ওপারের বুকে ব্যারিকেড করা পুলিশ আর সৈন্য দেখে। কিছুক্ষণ কেমন থম্‌ খেয়ে যায়। সামনের সারির লোকগুলোর চলার গতি যেন পিচগলা রাস্তায় আটকিয়ে যায়। পেছন ফিরে তাকায় কেউ কেউ। ভিড় থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসে অনেকে দাঁড়ায় রাস্তার ধারে। উত্তেজনায় কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্পে চকচক করে চোকমুখ। দৃঢবদ্ধ শক্ত চোয়াল-গুলো ঘামে স্যাঁত স্যাঁত করে। টুক্‌রো টুক্‌রো কথা আগুনের ফুলকির মত উড়ে চলে এক জনার ঠোঁট থেকে আরেক জনার ঠোঁটে।

: ওরা গুলী চালাতে পারে।

: নাও পারে। কাল চালিয়েছে আজ ভয় দেখাচ্ছে।

: মুস্কিল হলো, আমাদের কিছু অংশ ওরা মধ্যিখান থেকে ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

: তখন সেক্রেটারীয়েটের চাপরাশী, কেরানী, ওরা ষ্ট্রাইক করে আমাদের সাথে মিলতে আসতেছিল কিনা।

: হু, রেডিও আবার ষ্ট্রাইক। দারুণ ব্যাপাব কি বলেন? ঝাঁকালো চুলগুলো পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে বলে ওঠে একটা বাচ্চা মত ছেলে।

খুশীতে কেমন ঝলমল কবতে থাকে ওর চোখ-মুখ।

: সামনে থেকে ভাঙলে দেখাইতাম। কাপুরুষ। মধ্যেখান। বেইমান দূর—অ।

: গুলী চালাইব, চালাউক না। ডরাই না আমবা। কি ক'ন ডরান আপনে? আমাব কাঁধে ঝাঁকি দিযে বলে ওঠে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা চাপাবসা একটা লোক। গেঞ্জীটা দিযে মুখ মুছে নিয়ে চোখ জোড়া স্থির কবে রাখে আমাব মুখেব ওপব। ঠোঁটের কোণে নিভে যাওয়া বিড়িটা দাঁত দিয়ে চেপে বাখে।

: কি কন?

: চালাতে পারে। আমি সামনে ব্যারিকেড করা পুলিশগুলোব শক্ত হাতের মুঠিতে চেপে ধরা বাইফেলেব দিকে তাকিয়ে থাকি। ওরা কি আবার গুলী চালাতে পারে, গুলী?

: নাও ভি পারে, একবার ছাড়ছে, একদফা ডর দেখাইব।

যারা এই কাঠফাটা বোদে, মিছিলেব শবিক হযেছি—আমবা, ছাত্র-মজুব প্রত্যেকেই একেকটা শব্দেব কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালাম। স্কুলের ছাত্র থেকে শুরু করে রিকশাওয়ালা পর্যন্ত।

থমকিযে দাঁড়ানো মিছিলটাকে চিবে যায় একটা কথা—চার্জ!

হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যে যেদিকে পারে দৌড় দেয়। কে যেন মনের ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ চাপতে না পেরে ফেটে পড়েছে,— জুলুমশাহী।

বাতাস-চেরা গুলীর আওয়াজে শব্দটা ডুবে যায়।

ঃ ওরা আবার খুন করেছে। কে যেন ডুকরে ওঠে।

কান্নার সুর চাপা পড়ে যায় হাজারো পায়ের আওয়াজে।

চলতি পথে, গাছ তলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একটি নীল মলাটের খাতা। তারি ভেতর লেখা ছিল অনেক কিছু। জীবনের দৈনন্দিন পথের টুকরো টুকরো কথা। আর ছিল—

২০শে ফেব্রুয়ারী, ৫২ ॥

মানুষের জীবনে বহু আকাংখিত মুহূর্ত—ছোট বেলার কাল্পনিক খেলায়, কৈশোরের প্রারম্ভে যে কল্পনার বিন্যাসে অহেতুক সারা মুখটাকে লজ্জায় রাঙা করে তুলত আর যৌবনে যে রঙ্গীন মাদকতা সারা শরীরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে—চিন্তায়, স্বপ্নে, আমার জীবনে সেই স্বপ্নায়িত মহূর্ত দেখা দিতে চলেছে। জানালা থেকে চোখ জোড়া মেলে ধরেছি নীল আকাশের বুকে। চোখের মণি দুটোকে তুলে ধরেছি, না, ছুঁড়ে দিয়েছি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না সারা পৃথিবীটাকে ঢেকে দিয়েছে রূপালী বন্যায়। আকাশ ছাপিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে, পড়ছে বাড়ীর ছাদ বেয়ে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নীচের লোকদের মাথার ওপর।

রাস্তায় দাঁড়ানো লোকগুলো আশ্চর্য রকম নির্জীব। কিছুক্ষণ আগে এ রাস্তাটার ওপর দিয়ে ছাত্ররা ঘোড়ার গাড়ী করে আগামী কালের হরতালের কথা জানিয়ে গেছে। ঘোষণার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে সরকারী ভ্যানযোগে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারীর ঘোষণা প্রতিটি লোককে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এ আচ্ছন্নতা আমারও এসেছে। কেন জানি শিউরিয়ে উঠছি। আচ্ছা, জ্যোৎস্না কি সত্যিই, না আমার চোখের মণি ঘোলা? নিষ্প্রভ।

২১শে ফেব্রুয়ারী ॥

সারা শহরটা থমথমে। দোকান-পাট কিছু খোলা কিছু বন্ধ। ছাত্ররা জড়ো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। রাস্তায় পুলিশ, ট্রাক ভরতি। রোদ তেতে উঠেছে মাথার ওপরে। কপালের দু'ধারে রগ করছে দপ্ দপ্। মুখগুলো সবারই উত্তেজনায় চকচকে! চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখেমুখে ঠিকরিয়ে পড়েছে প্রশ্নের চিহ্ন। সবাই জানতে চায় কি হবে, কি করবে এখন।

·· একশো চুয়াল্লিশ ধারা সরকার জারী করেছেন। এখন মিছিল করা মানেই একশো চুয়াল্লিশ ভাঙ্গা। তাতে আমাদের লাভ হবে না, গণ্ডগোলের সম্ভাবনাই বেশী·· ।

সবাই ক্ষেপে উঠেছে শুনে।

: বিশ্বাসঘাতক।

: আমরা ফিরবো না। ক্রুদ্ধ চীৎকার ও টিটকারিতে থেমে যায় বক্তার আওয়াজ।

: আমরা মিষ্টি বুলি শুনতে আসিনি। আমরা জানতে চাই কি করবো?

জটলার ভেতর থেকে একজন লাফিয়ে উঠে প্রেসিডেন্টের টেবিলের উপর বলে চলে : বন্ধুগণ, সরকার একশো চুয়াল্লিশ দিয়ে আমাদের অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছে। আমরা, বন্ধুগণ একশো চুয়াল্লিশ ভাঙ্গবোই। তাই বলে মিছিল করবো না, প্রকাশ্যে বাইরে সভা করবো না। দশজন করে যাবো এসেম্বলী হলের দিকে। জানাবো আমাদের দাবী: সাড়ে চারকোটি জনতার দাবী··· ।

মাতৃভাষার দাবী। উত্তেজনায়, রোদের তাপে রক্ত ফেটে পড়তে চায় সারা মুখে-চোখে।

একটা শব্দ মাথার উপর ভেসে বেড়ায় : চলো এসেম্বলী।

ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে লম্বা হয়ে মিছিল বাঁধার সারি। ধাক্কাধাক্কি লেগে গেছে আগে দাঁড়াবার জন্য।

মিছিলের এক পাশে দাঁড়িয়ে ভেবেছি কি করবো? আমিও কি এ মিছিলে শরিক হবো? যদি কিছু হয়? সামনে ফাল্গুন……। মা তাই চিঠি লিখেছেন: তাড়াতাড়ি আসতে। রাস্তার দিকে চেয়ে থাকি। দেখি: ট্রাকে ভরতি পুলিশ। তেলে পালিশ করা লাঠির গিট আর সঙ্গীনের ফলাগুলো সূর্যের আলোয় চক্ চক করছে।

: টিয়ার গ্যাস ছাড়বে…একটা আওয়াজ দাঁড়ানো মিছিলের ওপর কেঁপে কেঁপে চলে। প্রতিটি ঠোঁট নড়ে ওঠে। একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে। পাশের দাঁড়ানো অচেনা সঙ্গীদের কাঁধে হাত রেখে কথা বলে। পরস্পরে বন্ধুর মত কথা বলে।

সারা মুখ ঘামছে। কান তাতে গরম হয়ে গেছে। সূর্য আজ কি আগুন ছড়াচ্ছে? সবার শিরায়, স্নায়ুতে রক্তে? ভাবছি কি করবো। আমি কি করবো? আজ আমাদের শিল্প প্রদর্শনী, আমার ছবি তাতে। বহু দিনের প্রত্যাশিত দিন আজ, শুধু আজ।

কি করে কখন চিন্তার সমাধান করে টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য আর সবার সাথে পুকুর থেকে রুমাল ভিজিয়েছি টের পাইনি। যখন পেলাম, দেখি গেটের সামনে পুলিশ ব্যারিকেড ভাঙ্গার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে আর অন্যের সাথে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলেছি: রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই-ই।

মেঘ না করে বৃষ্টি হওয়ার মতই লাঠি চার্জ শুরু হয়ে গেল। সামনের কয়েকজন গ্রেপ্তার হলো। যে যেদিকে পারলো দৌড়ালো। তারপর একসময় দাঁড়িয়ে পরে দেখলো রাস্তার দিকে। ট্রাকের মধ্যে বন্দীদের। সঙ্গীদের। ভেবে পাচ্ছেনা কি করবে? শুধু ওদের কণ্ঠের সাথে আওয়াজ মিলিয়েই চলছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

আবার দশজন করে বের হলো গেট দিয়ে। আওয়াজ তুলেছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। গ্রেপ্তার। আবার বের হলো। আবার

গ্রেপ্তার। কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে বের হবার জন্য। প্রত্যেকের মুখে একই প্রশ্ন, দেখি কতজনকে জেলে আটক রাখবে। দেখি কত যায়গা আছে জেলে ? কেউ বাদ গেল না কাড়াকাড়ি থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাশের ছাত্র থেকে শুরু করে ক্লাশ ফোরের ছেলেটা পর্যন্তও। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি সবাই।

ওদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ভিৎ নড়ে উঠলো। ফাটল ধরলো জায়গায় জায়গায়। তাই শুরু হলো টিয়ার গ্যাস ছোড়ার পালা। লং রেঞ্জ। শুধু রাস্তায় নয়! বিশ্ববিদ্যালয়েব ভিতরেও।

দৌড়ালো। বাচ্চা, বুড়ো সবাই। কাশলো সমানে খক্ খক্ খক্। চোখ বেয়ে নেমে আসছে পানি। ঘনিয়ে এলো চোখের পাতায় রাত্রির অন্ধকার। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দম।

পানি। কাববালার ময়দান হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর। সবাই ছুটেছে পুকুবের দিকে। একটু পানি এক টুকরো উজ্জ্বল হীরের চেয়েও দামী। আমিও চলেছি।

পালালো সব। কিন্তু নিস্তার নেই। চলেছে'ত চলেছেই টিয়ার গ্যাস আর টিয়ার বোমা ছোড়ার পালা। নিরস্ত্র ছাত্র আর সশস্ত্র বাহিনী। হটলো কিন্তু দমলো না।

ছত্রভঙ্গ। পুলিশরা হাসছে রাইফেল আলগা করে হাতে রেখে ধবে। ঠোঁট চাটছে জিভ দিয়ে। কপালের ঘাম মুছছে হাতের কর্কশ চেটো দিয়ে। অফিসাররা ঠোঁটের বাঁ কোণে আলতোভাবে সিগারেট চেপে টানছে। ছাড়ছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়া।

বাতাসেব উপব ভর দিয়ে এল বিষাক্ত সব ধোঁয়া! গ্যাস। ঢুকলো জানলা গলিয়ে, দরজার ফাঁক দিয়ে প্রতিটি ঘরে। কাশলো। ছাত্র। প্রফেসর। সবাই কাশলো খক্ খক্ খক্। একজনের রুমাল চলে গেছে অন্যের কাছে। দিয়ে দিচ্ছে স্বেচ্ছায়। ভ্রূক্ষেপ নেই কারোও। ভুলে গেছে নিজেকে নিয়ে শুধু থাকতে। কষ্ট পাচ্ছে। তবুও। অচেনা আজ বন্ধু। বন্ধুর চেয়েও বড়। সাথী।

বিশ্বাস করতে পারছে না। একে অন্যের দিকে ঘোলাটে চোখ জোড়া মেলে ধরেছে। আশ্চর্য হয়ে গেছে সব। তারাত কোন দিনই ভাবেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরও আক্রমণ চলতে পারে? জটলা বেধেছে জায়গায় জায়গায়। উত্তেজনায় চোখ-মুখ চকচক করে ওঠে। ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে যায় ঘামে ভেজা মুখগুলো। কলম ধরা নরম হাতগুলোও জমাট হয়ে ওঠে।

সূর্য মাথার ওপর। গন্ গন্ করে জ্বলছে আগুনের মত। তাত ছড়িয়ে পড়েছে নীচে। গরম হয়ে উঠেছে সব। মাঠ। রাস্তা। পানি। মানুষ।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো অনেকেই। খোঁচা খাওয়া গোখরো সাপের মত ফুঁসলো সব।—মার শালাদের।

ঃ বন্ধুগণ আপনারা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠবেন না। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবো। আমরা গণ্ডগোল করবো না। কিছু ক্রুদ্ধ ছেলেদের দিকে হাত জোড় করে বলে চলল অনেকেই। গলা তাদের বসে গেছে। ঘাম ছুটছে মুখ বেয়ে। ঠোঁটের কোণে জমে উঠেছে ফেনা। ছিটিয়ে পড়ছে ফেনাগুলো শ্রোতাদের দিকে।

ঃ শান্তিপূর্ণ! রাগে ফেটে পড়লো একজন। বিশ্বাসঘাতক, বেইমানের দল সব।

হ্যাঁ শান্তিপূর্ণ। আমাদের লক্ষ্য পুলিশের সাথে গণ্ডগোল নয়। আমাদের এসেম্বলি হলের দিকে যেতে হবে। এটাই মনে রাখবেন। দশজন করে আবার চললো গেট থেকে বের হতে। শ্লোগান উঠেছে: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। পুলিশ জুলুম চলবে না। ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে গেছে। চললো পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙ্গে দলে দলে ছত্রভঙ্গ হয়ে মেডিকেল কলেজের দিকে। ওখানেও গণ্ডগোল বাধে। মেয়েদের দলের ওপরও পুলিশের লাঠিচার্জ, তারপর গ্রেপ্তার।

সবারই মনে বিক্ষোভ। শুধু ছাত্র নয়। রাস্তার পাশে দাঁড়ানো কেরানী, চাপরাশী, রিকশাওয়ালা আর সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ। ছাত্ররা উন্মত্ত, কিন্তু শান্ত। তারা গালা দিয়ে আটকানোর মত মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলোকে শরীরের সাথে সেঁটে রেখেছে, গণ্ডগোল করবে না। কিন্তু হলো। বাধ্য হলো। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে মেডিকেল কলেজের ছাত্রনিবাসে। ক্ষেপে গেলো সব। বারুদে দিয়াশালাইর কাঠি পড়েছে। বিক্ষোভ ফেটে পড়ল আগ্নেয়গিরির গলন্ত লাভার মত। ছড়িয়ে পড়লো একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে।

সংঘর্ষ হলো উভয় পক্ষে।

বার বার চেষ্টা চলেছে হোষ্টেলের ভেতরকার ছাত্রদের ওপর লাঠিচার্জ করার। ছুটে আসলো তারা উন্মত্ত নেকড়ের মত। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে দেশের ভবিষ্যৎ রত্নদের।

বাধা দিলো সবই মরিয়া হয়ে। সার্ট ভিজে গেছে ঘামে। হাতে ফোস্‌কা পড়েছে ঢিল ছুঁড়ে!

টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে ওরা। সমানে ছুঁড়েই চলেছে। বাতাসে ঘনিয়ে এলো মৃত্যু। বিষাক্ত গ্যাস। শুধু গ্যাসে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলের বাতাস। আকাশ! একটা জলভরা কলসী নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো একটি ছেলে টিয়ার সেলের ওপর।

সবাই ছুটে চললো এসেম্বলী হলের দিকে। পারলো না। এসেম্বলী হলের সামনে পাহারারত সৈনিকের মেশিনগানের নল চক চক করছে সূর্যের আলো পড়ে। কেমন চোখ ধাঁধানো আলো আসছে ওখান থেকে।

শ্লোগান দিলো ছাত্ররা। বাচ্চারাও। গলার দম বন্ধ হয়ে

যাচ্ছে। বুক শুকিয়ে উঠেছে। ফুসফুস ছিঁড়ে যেতে চাচ্ছে। তাও মরিয়া হয়ে দিলো।

: এম-এল-এ রা বেরিয়ে আস।

: সভ্যপদ থেকে পদত্যাগ কর।

পুলিশ অফিসাররা জানালো আবেদন : লোক পাঠাও।

আমাদের সাথে আলাপ করো। তোমাদের কি দাবী জানাও।

ছাত্ররা থেমে গেলো। একে অন্যের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবতে থাকে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। কেউ ঘাসের বুকে পা ঘসলো। সিগারেট টানলো। মুখের ঘাম রুমালে মুছলো।

আমরা যখন সবাই একে অন্যের সাথে কথা বলায় মগ্ন, হঠাৎ কতকগুলো তীব্র আওয়াজে চমকিয়ে উঠি। কতকগুলো ছেলে শুয়ে পড়লো ইটের খোয়া দেওয়া রাস্তায়। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে সবাই।

বাতাস চিরে গুলী চলেছে আগুনের ফলা। কুড়ে কুড়ে চলেছে সীসের গুলী সেরা সেরা ছেলেদের মাথার ভেতর, পেটে, বুকে। ঘাসের বুকে, ইটের খোয়া দেওয়া রাস্তায়, ঘরের বারান্দায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা ছেলেরা হয়ত কারো একই ছেলে, স্বামী, হয়ত আরো, আরো অনেক কিছু।

বন্যায় আক্রান্ত পশুর মত সব পালালো। পিছন থেকে তেড়ে আসছে মৃত্যু। সীসের গুলী! এ যেন এক বিরাট উত্তাল, উদ্দাম ঢেউ, সমুদ্রের সমস্ত শক্তি নিয়ে আঘাত হেনেছিল তীরের খাড়া পাহাড়ের গায়, কিন্তু পাথরের তীব্র আঘাতে বিন্দু বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আবার ঢেউয়ে ঢেউয়ে। আমরা সেই ছড়ানো বিন্দু, মেডিকেল কলেজের ব্যারাক,—ঢেউয়ের সারি।

: ফাঁকা আওয়াজ। কে যেন নিষ্প্রাণ গলায় বলে উঠলো। গুলী

মাথায় অনেকেই আবার চললো আহতদের আনতে। বিস্ময়ে হত-বুদ্ধি হয়েও পরস্পরের কাছে মনের জ্বালা মিটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকে। কি করবে, সে চেতনা, বুদ্ধি অনুভূতি সবই যেন কি এক দুর্বার আকর্ষণে মুছে গেছে। একে অন্যের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। ভয় যতটা না পেয়েছে তার চেয়ে আশ্চর্য হয়েছে বেশী।

আহতদের অনেকেই নিয়ে চলছে। একজন চিৎকাব করে বলে ওঠে, ভাই সব, এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে! দাঁড়ানো ছাত্রদের লক্ষ্য করে বলে চলেঃ দেখুন বাংলা চাওয়াতে আমাদের উপহার!

পাশ থেকে একজন ফিস্‌ফিসি্‌য়ে বলে, ওভাবে বলবেন না, উনি ঘাবড়িয়ে যাবেন।

ঃ না কিছুই হয়নি। না কিছুই হয়নি। সবাই নিজেদের সান্ত্বনা দিচ্ছি। আমরা যেন উপলক্ষ্য, আহত ছেলেটাই প্রধান। অতি কষ্টে উচ্চারণ করছি আমরা কথাগুলো। দাঁত দিয়ে চেপে ধবেছি নীচের ঠোঁট। কি বেজায় শক্ত নীচের ঠোঁটটা। কি ভীষণ ভারী।

কলের পানির মত ঝর ঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে সবুজ ঘাসের ওপর। কিছুক্ষণ আগে যেখানে আমরা পরস্পরে আলোচনা চালিয়েছি, গল্প করেছি, সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলেছি সেখানে রক্তগুলো ঘাসের ডগায় ভাল করে বসতে না বসতেই জমে যাচ্ছে আমাদের চিন্তার মত।

ঃ পানি। আহত ছাত্রটির গলা ঠেলে অতি কষ্টে বেরিয়ে আসে একটি শব্দ।

টিয়ার গ্যাস থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কিছুক্ষণ আগে যে রুমালগুলো ভিজিয়ে ছিলাম প্রত্যেকেই তার মুখে নিংড়িয়ে দিই।

ফিস্ ফিস্ করে বলে······আমার বাড়ীতে খবর দেবেন। নামতা পড়ার মত বলে চলে······নাম আবুল বরকত, ঠিকানা বিষ্ণুপ্রিয়া

ভবন……পল্টন লাইন। তাঁর প্রশ্ন কেউ শুনলো কি শুনলো না সে দিকে কোন রকম ভ্রূক্ষেপ নেই, আশংকাও নেই।

ঃ কোন ভয় নেই আপনার। সান্ত্বনা দিলাম আমরা। সে যেন উপলক্ষ্য আসলে আমরাই লক্ষ্য। আমাদের কানগুলোকে সবাই সচেতন করে রেখেছি, ক্লাশে প্রফেসরের জরুরী নোট শোনার মত।

ঃ আমরা দমবো না, দমবো না। অস্পষ্টভাবে জড়ানো গলায় বিড় বিড় করে বলতে থাকে সে।

ইতিমধ্যে ইমার্জেন্সীতে এসে গেছি। নার্স এবং মেডিকেল ছাত্ররা টিয়ার গ্যাসে এবং লাঠি চার্জে আহতদের নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুত পড়ার মত ওরা চমকিয়ে ওঠে। ফ্যাকাসে চোখ মেলে ধরলো, আহতরা। এ ভয়ঙ্কর সত্য ঘটনা দেখে নিজেরাই আশ্চর্য হয়েছে। নার্সদের ডেকে বলে, আপনারা ওদের দেখুন। ওদের দেখুন। ব্যাকুলতা, হৃদয়াবেগে কেউ কেউ নিজেদের সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলে।

সমানে আসছে আহতরা। পিঁপড়েগুলো যেমন খাবার ঘিরে জটলা বেঁধে আসে, তেমনি আসলো সবাই। এক-দুই-তিন। কত গুণবো? একটা মানুষের স্নায়ুতে কতটা অত্যাচার সইতে পারে? ওয়ার্ডের পালিশ করা মেঝে রক্তে লাল হয়ে উঠলো। আজ যেন দোল পূর্ণিমা। রক্তের রঙে সব খেলে এসেছে। কিছুক্ষণ পর ষ্ট্রেচারে করে যে মৃতদেহটাকে নিয়ে এলো, সবাই তাকে দেখে, স্তম্ভিত হয়ে গেল। মনের জ্বালা মেটাবার ভাষা ভুলে গেল। সম্মোহিতভাবে তাকিয়ে রইল—মাথার খুলি নেই, মগজটা এক ধারে পড়ে আছে ষ্ট্রেচারের।

ঃ উঃ কি সাংঘাতিক! মুখ হাত দিয়ে ঢেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে স্কুলের একটা ছোট্ট ছেলে। আঙ্গুলের ফাঁকে রক্ত।

ঃ মাথা নিশানা করে তো রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের মারার কথা না। প্রশ্ন করছে না জবাব দিচ্ছে প্রশ্নকর্তা হয়ত নিজেও জানেনা।

ঃ ওরা খুন করার জন্যই মেরেছে। খুনী—ডাকাত। চোখটাকে দু'হাতে রগড়িয়ে নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে সেই ছেলেটা।

ঃ তোমার ভাই হয়? একজন ছেলেটার মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে বুলিয়ে প্রশ্ন করে। উৎসুক ভাবে চেয়ে থাকে ছেলেটা ঠোঁটের দিকে।

ঃ ভাই? না। একই সাথে পাশাপাশি ছিলাম। এই যে ওর রুমাল—টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচার জন্য আমাকে দিয়েছিল ও।

আমরা সবাই তাকিয়ে থাকি ওর হাতের দিকে। যেন ও হাতেব ছোট্ট মুঠিতে ধরা রয়েছে কোন দামী পাথর। হাতের রুমালটা রক্তে ভেজা। টপ টপ করে চুইয়ে পড়ছে রক্ত মেঝের উপর। সবাইর মুখ ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠে। একে অন্যের দিকে চায়। লাইটের আলোয় মুখগুলো ধারালো ছুরির মত ঝলসাতে থাকে।

সারা শহরে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা! হু-হু করে চলেছে বাতাস পাওয়া আগুনের মত, এ রাস্তা থেকে ও রাস্তায়, এ গলি থেকে ও গলিতে।

রাস্তায় জটলা বাঁধে। মানুষ ভুলে গেছে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারীর কথা। ভীষণ এক ঝড়ের তাণ্ডবলীলা যেন প্রতিটি মানুষকে করে তুলেছে আত্মনির্ভরশীল। একে অন্যকে জিগগেস করে, একঠো রিকশাওয়ালা ভি বলে মরিস্ গুলীমে?

ঃ হ লাশ বলে আবার গায়েব করেছে কয়েকজনার।

ঃ সাতজন এযাবৎ! আল্লা জানে আর কতটা।

লাইন বেঁধেছে। বড় বড় পা ফেলে চললো সব। মানুষের জীবন যেন আজ লাইনের প্রচণ্ড প্যাচে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ঘুম থেকে উঠে শোবার সময় পর্যন্ত অনবরত যে লাইন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, তার থেকে এ যেন অন্য।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণ ভরে গেছে বুড়ো, জোয়ান-বাচ্চায়।

হোষ্টেলে, ব্যারাকের ওপর শহীদদের রক্তাক্ত কাপড় নিশানের মত ওড়ানো। রক্তাক্ত যায়গাগুলোয় পবিত্র স্থানের মত ভিড় জমে উঠেছে।

ঃ লাশ কই। লাশ দেখমু। সবাইর গলায় ফেটে পড়েছে ক্রুদ্ধ চিৎকার।

কিন্তু দেখতে কেউ পেলনা।

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে মানুষের ভিড় পাতলা হয়ে এলো। দলকে দল ফিরে এলো। বুকে করে নিয়ে এলো ঘৃণা। আগুন। পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ধ্বংস করে ফেলবে সব।

রাতটা কি বেজায় হাল্কা সবুজ। জ্যোৎস্না সারা গায়। জ্যোৎস্না আজ আর মানুষের মাথায় ঝবে পড়বে না। মেডিকেল কলেজের হোষ্টেলের রক্তে চাক বাঁধা ঘাসে ঝরে পড়বে। ভিজিয়ে দেবে সব ঘাসের ডগাগুলো, সিগারেটের অর্দ্ধদগ্ধ টুকরোগুলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেন আজ আমার চোখের পাতা নেমে আসে, চোখেব কোণ ব্যথা করে? আমার মা কি আজ এ সন্ধ্যায় আমার জন্য উন্মুখ হয়ে ট্রেনের বাঁশীর আওয়াজ শুনছেন দেশের বাসায়? ছোট বোন শেফালী কি আজ সন্ধ্যায় তার ভাইর আসার জন্য ছটফট করছে? ভাই তার শহর থেকে তার জন্য কি আনবে এ চিন্তায় কি তার চোখে ঘুম ব্যাহত? মার চিঠিটা খোলা পড়ে রয়েছে—খোকা তাড়াতাড়ি আসিস। বাসায় জরুরী দরকার! ··

আজই তার যাবার কথা।

সারা মেসটা কি নিঃঝুম। রুম মেট এখনও ফিরেনি। সে কি ফিরবে না?

২২শে ফেব্রুয়ারী॥

সারা শহর কবরে চলে গেছে। মিলিটারী ট্রাক চলেছে রাজ-পথের উপর দিয়ে। দোকানপাট সব বন্ধ। রিক্সা, গাড়ী বাস কিছুই

বাদ যায়নি। রেডিও স্ট্রাইক। সরকারের নিজের অফিসও! এ-জি অফিস, সেক্রেটারিয়েট সব। ব্যাঙ্কও বার্দ যায়নি।

রাস্তাগুলো মিলিটারীর হেলমেটে বিদ্ধ। সূর্যের তাপে চক্‌চক্‌ করে বেয়োনেট, মেশিনগান আর ব্রেনগানের নল। সারা শহরের দেয়াল বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় রাতারাতি আঁকাবাঁকা হাতে লেখা পোষ্টারে ছেয়ে গেছে।······রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। হত্যাকারী ও দেশদ্রোহীর বিচার চাই।

রাস্তায় যায়গায় যায়গায় জটলা। মুখগুলো সব দৃঢ়ভাবে চাপা। হাতগুলো মুষ্টিবদ্ধ। চোখের কোণে বিদ্যুৎ চমকায়।

দূরে মিছিলের আওয়াজ ভেসে আসছে। সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মত আসছে হাজারো পায়ের আওয়াজ। ইতিমধ্যেই কোন এক পার্টির প্রতি দোষারোপ করছে সরকারপক্ষ আর তার অনুচররা। কিন্তু জনতার আগ্নেয়গিরিতে যে লাভা জমেছে তা থেকে অগ্ন্যুৎপাত হবে, হ্যাঁ হবেই। নিস্তার নেই কারো।

জনতার আন্দোলন আজ এগিয়ে চলেছে। মিছিল থেকে এসে······।

*　　*　　*　　*　　*

এর পর আর লেখা নেই।

হয়ত ইনি ২২শে তারিখের নিখোঁজদের মধ্যে কেউ হবেন।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত স্বাক্ষর

সালেহ আহ্‌মদ

'বন্ধুগণ, একশ' চুয়াল্লিশকে ভেঙ্গে আমরা এগোতে চাই না। কিন্তু তাই বলে মনে করোনা আমাদের সংগ্রাম—আমাদের জীবন এই খানটাতেই থেমে গেলো।' বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটা বুড়ো আমগাছ। ফুটন্ত বোল আর গুটির ভারে ছড়ানো ডালগুলো নুয়ে পড়েছে। তারই নীচে বোমারুর গুমোট আওয়াজের মতো একটা শব্দস্রোত পাক খেতে লাগলো ঘুরে ফিরে।

'আমরা ফিরে যাবার জন্যে বেরিয়ে আসিনি বন্ধু।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আওয়াজ তোলো......'

"রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই"

"আমাদের দাবী—মানতে হবে"

'আচ্ছা, বলোতো হে শরীফ, লোকটার মুখ দিয়ে অমনি কথা বেরুবে, আগে জানতে?' শরীফ চুপ।

উত্তর দিল একটা ইস্কুলের ছোকরা—

'থুথু ছুঁড়ে মারো ওর মুখে।'

'আর যদি না মারতে পারো, মনে রেখো আগামীকাল থেকে একটা জাতি মরলো। একটা ভাষা যার আখরে আখরে আমাদের আগুনের মত হৃৎপিণ্ড জড়িয়ে, শুকিয়ে গেলো।'

'আর এটাও মনে রেখো, মরতে হলে কোন নেতার প্রয়োজন নেই।'

'হ্যাঁ, আমরা আর বেড়ালের মতো বসে থাকতে পারবো না; বেরিয়ে পড়ো সবাই।'—

ইস্কুলের মেয়েগুলো যেন এক একটা কী!

আরে বোনেরা, মগজ ঠাণ্ডা রেখো! সেন্টিমেণ্টকে এরকম মুহূর্তে মোটেই আমল দিও না। চেয়ে ছাখো, গুণে ছাখো—কাঁদুনে বোমা আর রাইফেল।'

'কে হে?"

'এদেরকে আড়মোড়া কোরে বেঁধে ফেলে চলো আমরা এগোই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা সবাই।'

'আওয়াজ তোলো ··'

*   *   *

চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিটাকে অসম্ভব রকম ফুলিয়ে, লালচে গোঁপগুলোর প্রান্তে উল্লাস নিয়ে, কোমরের পরিবেশে হাত রেখে এগিয়ে এল পুলিশের এক সাহেব আর এগুবার মুখে বাধা দিল দশজন ছাত্রকে।

বেঅনেট উচিয়ে চকচকে চোখ ছুটোয় তাকিয়ে আছে এমন অনেকে যারা আমাদের হৃদপিণ্ডে জড়ানো অক্ষরকে কোনদিন চেনে না, আগামীকালও চিনবে না।

এই আমাদেব প্রথম দশজনী মিছিল।

ইউনিভার্সিটি, কতকগুলো হল, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইণ্টারমিডিয়েট, আর্ট ইনষ্টিটিউট আর ইস্কুলের ছাত্রের অগ্রদূত নিয়ে এই আমাদের প্রথম দশজনী মিছিল! আইন ভাঙলো ওরা! মানুষ আইনের স্রষ্টা, আইন মানুষের স্রষ্টা নয়, আর ওরাই মানুষ।

পোড়া পেট্রোল উড়িয়ে দিয়ে একটা জীপ ছেড়ে গেল। আমাদের প্রথম মিছিলের সংগ্রামীরা জীবন্ত চোখে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। আমরা হাত ওড়াচ্ছি। ওদের চোখে—'তোমরাও আসো' আর আমাদের হাতে—'আমরাও আছি।'

বেরুলো দ্বিতীয় দশজনী মিছিল। এগ্রিকালচারাল ইনষ্টিটিউট,

ভেটেরিনারী স্কুল, টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট আর কমার্শিয়াল কলেজের ছাত্ররা যোগ দিয়েছে এবারে। বেরুলো তৃতীয়। পুরোভাগে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ছাত্র।

চতুর্থ ....

ওড়নায় বুক বেঁধে বেরিয়েছে স্কুল-কলেজের এক দঙ্গল ছাত্রী। ওরা যেন বাতাস। ওরা যেন ঝড়ের বাতাস। মিলিয়ে নেবার গতানুগতিক ছন্দ ছেড়ে এক বিচিত্র তরঙ্গে ওদের অঙ্গভঙ্গী। আর আকাশে আওয়াজ ঝড়ের শাঁখের মতো।

পুলিশী কর্তারা অপ্রস্তুত আর বোকাহাবা। জীপ নেই ট্রাক নেই। কয়েদীদের কয়েদখানায় পৌঁছে দেবার যন্তর নেই। হাওয়ায় কর্পূরের মত ফুরিয়েই গেছে। রাস্তায় পিচ তখন ঘেমে উঠছে! ঘেমে উঠেছে ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিশ সায়েবরাও।

আমরা আরো অনেকে বেরুচ্ছি .....

আরো ....

* * *

'বুম্'......

একটা আওয়াজ। অনেক ধোঁয়া...

আমের কচি গুটিগুলি কালো হয়ে গেলো।

রুমাল, গেঞ্জি আর শাড়ী-ওড়নার আঁচল ভিজিয়ে নিয়ে নাকে-মুখে-চোখে চেপে আছি আমরা সবাই আর ধোঁয়াগুলো যেন যোগসাজস করে আমাদের গলা টিপতে এগিয়ে আসছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে। মাঠের মাঝখানের পুকুরটায় হাঁটু ডুবিয়ে বালতি আর কেরোসিনের পুরানো টিন বোঝাই ক'রে কাদা-ভর্ত্তি পানি আনা হচ্ছে। আঁজলা পেতে তাই নিচ্ছে সবাই। কাঁধে করে একটিন পানি আনছিল এক ছোকরা, যে নাকি আমারি সহপাঠি, ঠিক তার নাকের ডগায় উড়ে এসে একটা কাঁদুনে বোমা ফাটলো। আমার

সহপাঠি পড়ে গেল। টিনটা পড়ল গড়িয়ে। আর ওটার ভেতরকার সমস্ত পানি, যে পুকুর থেকে আনা হয়েছিল, তারই সাথে ছোটবড়ো নালা বেয়ে মিলে গেল

রাইফেল আর টমিগানওয়ালারা তখন উত্তর-পশ্চিম কোণাকুণির দিকে এগিয়ে গেছে। কেননা, সেখানে আছে মেডিক্যাল ছাত্রাবাস আর ওখানকার ছাত্ররা নাকি তাদের দাবী জানিয়ে রীতিমতো অন্যায় করে ফেলেছে।

আমরাও দু'হাতের পাঞ্জায় চোখ ঢেকে কানা ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছি! উত্তর-পশ্চিম কোণাকুণি।

* * *

বেড থেকে উঠে বসেছে রোগী আর রোগিণীরা। অনবরত খুশ্‌খুশে গলায় কাশছে আর লাল চোখগুলোকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে নিচ্ছে। যারা জানলার কাছ ঘেঁষে, তারা তাকাচ্ছে রাস্তার দিকে। বোকা হাবার মতো তাকাচ্ছে। যারা মাঝখানে ও ভেতরের দিকটায় তারা তাকাচ্ছে কড়িকাঠের দিকে। তারা দেখছে—গ্যাস! সাদা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী অজস্র। কী বিকট গন্ধ আর চোখে জ্বালা। ডাক্তার আর নার্সরা ওষুধ, সিরিঞ্জ, ব্যাণ্ডেজের কাপড় নিয়ে করিডর দিয়ে দৌড়ুচ্ছেন এক হাতে চোখ-মুখ-নাক চেপে।

ইমারজেন্সিতে যারা, তারা দেখছে তাদের আশেপাশে উপরে নীচে ছোট-বড়ো-মাঝারি বয়েসের ছাত্র-ছাত্রীর মুখ, সে সব ছাত্র-ছাত্রীরা গ্যাসের আক্রমণে মুচড়িয়ে উঠছে, নরদমার মাছিগুলার মতো কাতরাচ্ছে আর পেট চাপড়াচ্ছে!

"মৃতপ্রায় রোগীদের ওপর স্বৈরাচারী সরকারের ঘৃণ্য জারের মতো অত্যাচার আর কতো চোখ বুজে সইবেন আপনারা? আপনারা কি কেউ এগুতে পারেন না!"

"রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই"······

অনেকে এগিয়ে আসছে এদিকে। একটা লম্বা হাতল-ওয়ালা

বেঞ্চির উপর কাতার দিচ্ছে সবাই আর চোখের ঢাকনিগুলো তুলে ধরছে। দুজন ডাক্তার যাঁদের একজন হচ্ছেন গিয়ে এখানকারই থার্ড ইয়ারের জনৈকা ছাত্রী, ড্রপারে করে লিকুইড প্যারাফিন তুলছেন আর ঢাকনি-তোলা চোখগুলোয় দিচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্য চোখদুটো রগড়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই।

হৃদরোগীদের ওয়ার্ডের ওপর উড়ে এল দুটো কাঁদুনে বোমা পর পর আর ফেটে গেল আওয়াজ করে।

সবাই তখন আরো কয়েক পা এগিয়ে গেছে।

* * *

হাসপাতালেব সীমানার ভেতর ঢুকে যে সব মুখোসধারী সৈন্য-গুলো এদিকে সেদিকে ঘুরছিল ও কাঁদুনে বোমা তাক করছিল, আমরা কয়েকজন মিলে তাদেরকে হটিয়ে দিলুম। পূর্বদিকের রাস্তায় হটিয়ে দিলুম। লাল লাল ইটের টুকরোগুলো যেন আষাঢ়ে বৃষ্টির ফোঁটা। সে বৃষ্টিব ঝাপটায় অনেকেব হেলমেটগুলো পর্য্যন্ত উড়ে গেলো। ইট ছাড়া আমাদের হাতে আর কিছু নেই। কারণ আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। এসেছি স্বতঃস্ফুর্তভাবে মাতৃভাষার বেদীতে নিজেদের সমর্পণ করতে। কিন্তু তাই বলে মুমূর্ষু রোগীদের ফুসফুসের চাকতিতে কাঁদুনে গ্যাসের আস্তরণ দেখবার প্রোগ্রাম করেও আসিনি তো!

উঁচু গাঁটওয়ালা লাঠিগুলো বন্-বন্ করে মৌমাছিদের মত ঘুরতে শুরু করেছে। একটার দাপট উড়ে এসে কাৎ করে ফেলে দিল রাস্তার পূর্বদিকে দাঁড়ানো একটা ছাত্রকে।

তারপর আবার উড়ে এল লাঠিটা! সাথে সাথে আরো অনেক লাঠি ডানা মেলে ঝাঁপ দিল ওর নীল দেহটার ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে নরদমার ভেজা বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ওর দেহটা।

ওরা এখনো মারছে। শুকনো দেহওয়ালা ধাঙরগুলো যেমনি ভাবে মেরে ফেলে শহরের পাগলা কুত্তাদের। দৌড়োয় কুত্তার পিছু

পিছু। চোখত্বটো চক্ চক্ করে ঝিলিক মেরে ওঠে। মুানিসিপ্যালিটি থেকে বকশীস্ মিলবে!

দ্বিতীয় কিস্তিতে সঙীন।

সঙিনের খোঁচায় ডান-চোখ-গলে-যাওয়া কে একজন ভেড়ার মতো দৌড়চ্ছে। কী করুণ! অথচ সত্যি।

সমুদ্র তরঙ্গের মতো ফেনায়িত হয়ে উঠেছে বিক্ষোভ। পুলিশী প্রতিরোধের কাঁটাতার মাকড়সার সুতোর মতো মনে হোল কয়েক মুহূর্তের জন্যে।

এবং তারপর আওয়াজ হোল।

ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো একটা শিমূলগাছ হতে ফুটন্ত আর আধ-ফুটন্ত রক্তলাল ফুলের সমারোহ নিয়ে গোটাকতোক মাঝারি গোছের ডাল মাটিতে এসে নামলো। আমরা সবাই মিলে তাকালুম ফুলগুলোর দিকে।

আওয়াজ হোল।

"রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই"···

আওয়াজ হোল।

ছাত্রাবাসের গোটাকতোক বাঁশের চালা ফুটো হোল এবং সেই ফুটোগুলোর ভেতর দিয়ে ধোঁয়ার আনাগোনা চলতে লাগল নির্বিকারে।

আওয়াজ হোল।

"রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই-ই"···

আওয়াজ হোল। পর পর। ইদিকে সেদিকে।

আমার চোখের সামনে আমাদেরি এক ছাত্র ভাইয়ের গোড়ালিটা উড়ে গেল। রক্তের ধারা মাটিতে এসে নামল। আমরা সবাই মিলে তাকালুম ওদিকে। আমরা যেন শিমূলের সমারোহ দেখছি।

একটি বুলেট ঢুকল আমাদেরি এক ছাত্র ভাইয়ের পেটে। যকৃৎ

পাকস্থলী, প্লীহা, অন্ত্র, মূত্রাশয় আর শিরা-ধমনীকে সুতোর মত ছিঁড়ে দিল বুঝি এক লহমায়।

আওয়াজ হোল। "রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই, আমাদের দাবী মানতে হবে"...

আর গোটাকতোক ছাত্র ওদিকে এগিয়ে গেল বুকে জড়িয়ে ধরতে গেল শহীদকে।

সাথে সাথে উড়ে এল বুলেট। আমাদের ভেতর থেকে একজনের মাথার খুলির অর্দ্ধেকটা উড়ে গেলো। মস্তিষ্কের পিণ্ডটা ছিঁড়ে গেল কুটিকুটি হয়ে। একটা সূর্যমুখীর স্বর্ণ-রেণুগুলো যেন ঝরে পড়লো। আশ্চর্য্যভাবে ঝরে পড়লো।

'আমাদের মারলো ওরা! আমরা তো কিছুই করিনি!'

'শুধু এইটুকু জানিয়েছিলাম যে, বাংলা আমাদের জীবনে জড়ানো।'

'ওইটুকুই যথেষ্ট হে উজবুক!'

'দেখুন, আমার ভাইকে দেখেছেন কেউ?—আমার ভাই... বয়েস বারো তেরো ..শ্যাম বরোন ..মাসুদ-উল হক...বেতবুড়ি প্রাইমারী ইস্কুলের ছাত্র...বৃত্তি পরীক্ষা দিয়েছে...কেউ দেখেছেন আপনারা?...দেখুন একটু ইদিকে। সেই গোড়ালি-ওঠা ছাত্রটি মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে এগুচ্ছে আর কাকে যেন এসব প্যাঁচাল শোনাচ্ছে!

কেউ কেউ বা এক লহমার জন্য নজর দিচ্ছে ওদিকে।

আমরা সবাই তখন ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণের সবুজ দুর্বার ওপর শুয়ে পড়েছি, যে দুর্বাকে সবুজ বলাব অধিকার আমরা এইমাত্র হারিয়েছি।

কারণ তখন দুর্বায় রক্ত আর রক্তে আগুন।

* * *

আমরা কয়েকজন রয়েছি কলেজের নোটিশ বোর্ড টাঙানো

দেয়ালটাকে আড়াল দিয়ে। সুইট পি'র চারাগুলোর পেছনটায় লাল ছুর্বীর ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে কেউ কেউ। হাসপাতাল বাগানের হরেক রকম ফুলগাছগুলোর নরম লতাপাতাগুলো যেন ওদের ব্যারিকেড। আমার পরিচিত একজন ছাত্রকেও ওখানটায় দেখতে পাচ্ছি।

নিউ কনষ্ট্রাকশনের ইটের পাঁজাগুলোর পাশ থেকে সৈন্য আর পুলিশের সামনাসামনি খোলাখুলি দাঁড়িয়ে অনেকে।

আর বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীরাই ভীড় করেছে ইমারজেন্সিতে যাওয়ার করিডরটার ছুপাশে লাইন করে।

'সরে যান আপনারা, সরুন বলছি।

'ফায়ারিং ?'

'হ্যাঁ।'

'ক্ষতি কদ্দুর ?'

ততোক্ষণে ঘাড়ের কাছটায় আর উরুতে ছুজন ছাত্র তাদের চারটে হাত দিয়ে জখমীটাকে বয়ে নিয়ে আড়ালে চলে গেছে।

'কিস্‌স্যুনা, একটা কনুই উড়ে গেছে শুধু।'

'অ্যাঁ !'

'আঁতকাচ্ছেন কেন মশাই, আওয়াজ তুলুন।'—বড়ো জোর ফাইভ কিম্বা সিক্সের একটা ছাত্র ভীত লোকটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সাহস যোগালো—বড়ো জোর ফাইভ অথবা সিক্স। আমার হাত পাঁচেক দূর দিয়ে একটা ষ্ট্রেচারে করে কারা একটা কী বয়ে নিয়ে গেল। এক গুচ্ছ ঘন লাল চুল আর লাল মাংসের আকারে একটা মুখ—জায়গায় জায়গায় ছু'একটা দাঁতের ছু-চারটে টুকরো। ফাইভ অথবা সিক্সের ছোকড়াটা দৌড়ে গেল ওদিকে।

শুনলুম নাকি কোন্ ইস্কুলের এক ছাত্রী। টেষ্টে ফার্ষ্ট হয়ে উঠেছিল এবার। বড্ড গরীব নাকি ?'

'আমাদের মুখের বুকের ভাষা, যা নাকি ডুবতে যাচ্ছিল, তাকে স্মরণ কর ভাই আর বোনেরা।'

'একবার বিদায় দাও মা আমায়, ঘুরে আসি।'

'আরে, তুমি আছো আখতারুজ্জমান?'

'তুমিও আছো?'

'তারপর, চললে কোথা?

'সামনে।'

* * *

'আরে, আলাউদ্দিন নাকি হে? আমাদের ওপর লাঠিচার্জ করতে এসেছো তো?

'তুমি এখানে আশরাফ! তাহলে ত্যাখো—খাকি পোশাকের ভেতরে একটা দরদী মানুষ, যে পৃথিবীতে এসেই 'মা' বলে ডেকে উঠেছিল বাংলা ভাষায়, নাড়া দিয়ে উঠল। আর তার শিথিল হাতের আঙুলগুলো থেকে শক্ত লাঠিটা খসে পড়ল।

এগিয়ে গেল আরেকটা ছাত্র আর আলাউদ্দিনকে উদ্দেশ করে বলল, 'তাহলে বলো "রাষ্ট্রভাষা—"

'অ্যাই বানচোত কা বাচ্ছা'—ঘুরে দাঁড়ালো একজন আর হিল করল জোরসে আলাউদ্দিনকে।

আলাউদ্দিন পড়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই শক্ত লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

'শূয়ার!' খেঁকিয়ে উঠল আমাদের ভেতর থেকে লোকটা। একজন হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে দেয়ালের আড়ালে আড়ালে একটু করে থামছে আর মুখ খিস্তি করছে।

ছাত্রাবাসের শেডগুলোর মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বৃত্তাকার সমাবেশ।

ছাত্রাবাসের সীমানার ভেতর অনেকগুলো মোটা পাইপওয়ালা পানির কল। অবিরল ধারায় পানি পড়ছে আর তার চারপাশ ঘিরে

বিরাট ভীড় আঁজলা পেতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজনের তাগিদে অনেকেই নালা-নরদমার সরু স্রোত থেকে তাদের টুকরো কাপড় ভিজিয়ে নিচ্ছে।

'কি হে, প্রদীপ, ব্যাপারটা কী?'

'ছুটো রিক্‌শাওয়ালা।'

'শেষ?'

'না, রক্তঝরা এখনো শেষ হয়নি।'

অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সমবেত ভীড়কে ঠেলে অনেকে এগিয়ে গেল ওদিকটায়। জনা সাতেক প্রৌঢ় বয়স্ক লোককে ঘিরে তেরছা লাইন করা গোটা তিনেক শেডের আড়ালে আরেকটা জটলার স্ফীতি ক্রমে বেড়ে উঠছিল। বছর পঞ্চান্নর এক বুড়ো কলম হাতে ঝুঁকে পড়েছে এক শীট সাদা কাগজের ওপর। তার সামনে পুঁতে দেয়া হয়েছে একটা রক্ত পতাকা যা নাকি লাল করা হয়েছে একটা রিক্‌শাওয়ালার রক্তে।

'হ্যাঁ, হে বাঙলার সুযোগ্য সন্তান!'

'রক্ত দিয়ে হাতে খড়ি!'

'জলদি করুন বলছি। আরো আধ ডজন পার্লামেণ্টারী মেম্বর রয়েছেন, ওনাদের নাকি রক্ত খাবার সাধ হয়েছে!'

কাঁপা হাতের রক্ত-অক্ষরে লেখা হোলো এক ইশতেহার। বাংলার বুকের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার এক জীয়ন্ত শপথ। লেখা শেষ করে অর্থহীন দৃষ্টিতে চোখ তুলে তাকাল পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর বিরাট স্থূল মাথাটা।

ছাত্র-পরিখার ভেতর একপাল জন্তু কেমন করে ছিটকে এসেছে।

* * *

সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু প্রাণপণ প্রচেষ্টায় আমাদের ছাত্র-তরঙ্গের ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে আর পশ্চিমাকাশের রক্ত-ফুসকিগুলো আমরা শুষে নিতে চেষ্টা করছি।

এই গোধূলির কি জানি কেমন হাওয়া-বাতাসে মনের ময়ুরগুলো যেন অবাক। আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন মৃত। যারা বেঁচে গেছে কোন রকমে তাদের অনেকেই শহরের আগুন মাড়িয়ে নীড়-মুখো। যারা রয়ে গেছে তারা থাকবেই।

ওদিকে হাসপাতালের ইমারজেন্সি, সার্জিক্যাল আর মিডওয়াই-ফারিতে যত বেডের সংখ্যা তার দ্বিগুণ ত্রিগুণ হয়ে হু হু করে বেড়ে চললো জখমীদের সংখ্যা। যত সার্জেনদের সংখ্যা, তার বহুগুণ হচ্ছে গিয়ে অস্ত্রোপচার প্রার্থীদের সংখ্যা!

যাদের পেট বুক মাথায় গুলীর সাংঘাতিক রকমের আঘাত তারাই বেড পাবার যোগ্য। যাদের হাত পা উড়ে গেছে, তারা গড়াগড়ি পাড়ছে ইলেকট্রিক বালবের শেড-দেওয়া ঘন নীল আলোর নীচে চক্‌চকে পালিশ-করা ঠাণ্ডা সিমেণ্টের বুকে একটা তোষকের আস্তরণে। তারা কাতরাচ্ছে। কিম্বা মরফিয়ার শক্তির সাথে হাত-পা ছুঁড়ে লড়াই করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

ওদিকে জনতা।

ওদিকে কিছু শোনার জন্যে, কিছু কোরবার জন্যে উদগ্রীব আর অধীর জনতা। ছাত্রাবাসের চারপাশের রাস্তায় রাত্রির অন্ধকার কালো বুক জনতাসমুদ্রে ডুবে গেছে।

'বন্ধুগণ, আমাদের মুখের ভাষাকে কেড়ে নিতে কেউ পারবে না। এই বিশাল ছাত্রতরঙ্গের হাতে হাত দিয়ে এগিয়ে আস্থন আপনারা জনতা সমুদ্র···।'

মাইকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমরা এখান থেকেই···

আর শুনছি আকাশের-বুক-চেরা আওয়াজ—

"রাষ্ট্রভাষা—বাংলা চাই"···

—আজ যে অগণন কমরেডরা আমাদের রক্ত ঝরিয়েছে, যাদের শবগুলো কাঁধে নিয়ে আমরা আগামীকাল সকাল দশটায়

শহর প্রদক্ষিণ করবো, তাদের রক্তমসী দিয়ে আপনারা লিখুন রক্তশপথ।

*　　　　*　　　　*

রাত দুপুর। ঘুম নেই আমাদের কারুর চোখের পাতায়। আমরা সব্বাই জেগে আছি। আমি রয়েছি আমার হাজারো কমরেডদের সাথে হাসপাতালের সীমানা ঘিরে যে কাঁটাতারের বেড়া, তারই গা ঘেঁষে। আমরা ব্যারিকেড তৈরী করেছি।

আমাদেরি কেউ কেউ গেছে লাশগুলোর পাহারায়। তারা মড়াগুলোকে জাপটে পড়ে আছে। আঁকড়ে আছে যেন হৃদপিণ্ড। আমাদের অ-আ-ক-খ-কে যেমনি আমরা ভুলবোনা, তেমনিই ভুলতে পারবোনা ওই মড়াগুলোকে।

আমাদের জীবন্ত চোখের সামনাসামনি ধারালো বেঅনেট এগিয়ে আসছে অনেক ভূতুড়ে ছায়ার মতো, কাঁদুনে গ্যাসেব ধোঁয়া আকাশের বুকে টুকরো মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে রাইফেলের দু'একটা ফাঁকা আওয়াজ যেন সেই মেঘের বুকে বিজলীর মতো। আমাদের জয়দৃপ্ত সমবেত ঘোষণা ঘুমহীন শহরকে কাঁপিয়ে তুলছে।

কয়েকটা হ্যাঁচকা বাতাসের ঝাপটা এলো। আর সেই ঝাপটার আঘাতে কাঁদুনে গ্যাসের মেঘগুলো ছিঁড়ে গেলো! সুদূর দিগন্ত থেকে দীপ্ত আলোর অগুণতি তির্যক রেখা ভেসে এসে আমাদের সব্বাইর চোখে-মুখে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

পাঁচটি আঙ্গুল আস্তে আস্তে গুটিয়ে এলো। পাঁচ আঙ্গুলে মিলে একটা মুঠোর জন্ম হোল।

নির্ঘুম শহরের প্রতিটি রোড-স্ট্রীট-লেন-বাইলেনের জনতা-সমুদ্রের বুক থেকে কুয়াশার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে অগণন মুঠো আকাশের বুকে উঠে গেলো।

নিষ্কম্প সব হাত।

একুশের গান
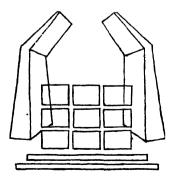
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কাবোশেথীরা
শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,

দেশের সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবী
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি ?
না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

সেদিনো এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষ
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে ;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো ক্ষ্যাপা বুনো ॥
সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলী ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,

দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী একুশে ফেব্রুয়ারী ॥

আবদুল গফফার চৌধুরী

রক্ত শপথে আমরা আজিকে তোমারে স্মরণ করি
একুশে ফেব্রুয়ারী
দৃঢ় দুই হাতে রক্ত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরি
একুশে ফেব্রুয়ারী
তোমাকে স্মরণ করি ॥

তুমি হয়ে আছ আমাদের মাঝে চিরজ্যোতি অম্লান
তোমার বক্ষে কত না শহীদ রক্তে করিল স্নান
কত বীর ভাই সেদিন জীবন করে গেল বলিদান
সেদিন প্রথম ভীরু কুয়াশার জাল গেল দূরে সরি ॥

সেদিন প্রথম ভয়ংকরের পথে শুরু অভিযান
সেদিন প্রথম লক্ষ কণ্ঠে জাগিল ঐকতান
সেদিন প্রথম ভীরু জনতার শিরদাড়া হল টান
সেদিন প্রথম দুঃশাসনের উঠিল টনক নড়ি ॥

রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল সেদিন মাটির বুক
আকাশের দিকে দৃঢ় হাত তুলে জনতারা উন্মুখ
দুঃশাসনের পেষণ রুধিতে হ'ল দৃঢ় উৎসুখ
লক্ষ জনতা একাকার হল মিছিলের পথ ধরি ॥

আজো ভুলি নাই সেদিনের সেই সংগ্রামী অভিযান
আজো ভুলি নাই সেদিনের সেই অমর শহীদ প্রাণ
আজো অলক্ষ্যে তাঁহারা জানায় উদাত্ত আহ্বান
তাইতো আমরা সেই এক পথে সবাই ঝাপিয়ে পড়ি ॥

তোফাজ্জল হোসেন

আমার এমন মধুর বাঙলা ভাষা
ভায়ের বোনের আদর মাখা
মায়ের বুকের ভালবাসা ॥

এই ভাষা রামধনু চড়ে
সোনার স্বপন ছড়ায় ধরে
যুগ যুগান্ত পথটি ভরে
নিত্য তাদের যাওয়া আসা।

পূব-বাঙলার নদীর থেকে
এনেছি এর সুর
শস্য দোলা বাতাস দেছে
কথা সুমধুর ;
বজ্র এরে দেছে আলো
ঝঞ্ঝা এরে দোল দোলালো
পদ্মা হ'ল সর্বনাশা।

বসনে এর রঙ-মেখেছি
তাজা বুকের খুনে
বুলেটেরি ধুম্রজালে
ওড়না বিহার বুনে,
এ ভাষারি মান রাখিতে
হয় যদি বা জীবন দিতে
চার কোটি ভাই রক্ত দিয়ে
পুরাবে এর মনের আশা।

হবে হবে জয় তোমাদের হবে জয়
তোমাদের খুনে রঙিন হইয়া জনমিবে বরাভয়।

রাজ ভয় আর রাজ কারাগার
যুগে যুগে যার খুলে দিল দ্বার
ফাঁসির মঞ্চ ঘোষিল যাহার অমরতা অক্ষয়।
অস্ত্র যাহারে ছেদন করেনি
বহ্নি দহনে যেজন দহেনি
সেই শাশ্বত প্রাণ প্রবাহিনী দিগন্তে মহা উদয়।
জবাকুসুমের দ্যুতি মনোরম
জাগিছে প্রভাত উজ্জ্বলতম
চরণে দলিত মহা নির্মম আঁধার লভিছে ক্ষয়।
ভয় নাই নাহি ভয় !!

জসীম উদ্‌দীন

ওরা আমার মুখের কথা
কাইরা নিতে চায়।
ওরা, কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়॥

কইতো যাহা আমার দাদায়
কইছে তাহা আমার বাবায়
এখন, কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য কথা শোভা পায়॥

সইমু না আর সইমু না
অন্য কথা কইমু না
যায় যদি ভাই দিমু সাধের জান॥

ঐ জানের বদলে রাখুম রে
বাপ দাদার জবানের মান॥

যে শুনাইছে আমার দেশের
গাঁও গেরামের গান
নানান রঙের নানান রসে
ভইরাছে তায় প্রাণ।
চপ কীর্তন ভাসান জারী
গাজীর গীত আর কবি সারী
আমার এই, বাংলা দেশের বয়াতিরা
নাইচা নাইচা কেমন গায়॥

তারই তালে তালে হে
ঢোল করতাল বাজে ঐ
বাঁশী কাসি খঞ্জরি সানাই।
কও দেখি নাই এমন শোভা
কোথায় গেলে দেখতে পাই ॥

পূবাল বায়ে বাদাম দিয়া
লাগলে ভাটির টান
গায়রে আমার দেশের মাঝি
ভাটিয়ালি গান।
তার ভাটিয়াল গানের সুরে
মনের দুস্কু যায় রে দূরে
বাজায় বাঁশী সেই না সুরে
রাখাল বনের ছায় ॥
ওরা যদি না দেয় মান
আমার দেশের যতেক গান
আছে, তার সাথে মোর নাড়ীর যোগাযোগ
আপদ বিপদ-দুঃখে-কষ্টে
এ গান আমায় ভুলায় শোক।
টুং টা টুং দোতারা আর
সারিন্দা বাজাইয়া
গাঁয়ের যোগী ভিক্ষা করে
প্রেমের সারী গাইয়া ॥
একতারা বাজায় বাউল
ঘুচায় মনের সকল আউশ
তারা মারফতি মুর্শিদী তত্ত্বে
পথের দিশা দিয়া যায়।

ওরে আমার বাংলা রে
তোর এই সোনার ভাঁণ্ডারে
আরো কত আছে যে রতন
মূল্য তাহার হয় না দিলেও
মণি মুক্তা আর কাঞ্চন ॥
আর এক কথা মনে কইরা
আখি ঝইরা যায়
ঘুম পারাইনা গাইতো যে গান
মোর দুখিনী মায়।
ওমায়, সোনা মাণিক যাদু বলে
চুমা দিয়া লইতো কোলে
আরো আদর কইরা কইতো মোরে
আয় চান আমার বুকে আয়।
আমার মায়ের মতন গান
আমার মায়ের মতন প্রাণ
এই, বাংলা বিনে কারোর দেশে নাই
সেই, মায়ের মুখের মধুর বুলি
কেমন কইরা ভুলুমরে ভাই।
মরা গাঙে যাদের গানে
আইজো ডাকে বান
কেমন কইরা ভুলুমরে ভাই
তারার এমন দান ॥

মুকুন্দ দাশ পাগল কানাই
হাসান মদন আর লালন সাই
ওরা, এদের মুখেও মারে লাথি
এই দুঃখ কি সওয়া যায়।

এই গুনীদের রাখতে মান
জীবন কেবা দিবা দান
তোরা, দলে দলে আয়রে সবে ভাই
নইলে কিন্তু জন্মের মত
মুখে তোদের পরবে ছাই ॥
ভুলিস নারে ওদের কথায়
ভাইরে করি মানা
থাকতে জবান হইস না বোবা
চোখ থাকিতে কানা।
তোর, পিঠ চাপড়াইয়া কইয়া দাদা
তোরে, চায় করিতে ধোপার গাধা
ওরা, এই বাসনায় সভায় সভায়
মিটা বুলি কইয়া যায় ॥

দুইশ বছর ঘুমাইলি
আর কেনরে বাংগালি
জাগরে এবার সময় যে আর নাই
আইজো কি তুই বুঝবি নারে
বাংলা বিনে গতি নাই ॥

আবদুল লতিফ

একুশের ঘটনাপঞ্জী

যেন ভুলে না যাই

খোন্দকার গোলাম মুস্তাফা

১৯৫২ সালের মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস মূলতঃ প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর এ দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট-ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে। তৎকালীন মুসলিম লীগের প্রাচীনপন্থীদের নিকট লাহোর প্রস্তাবের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল-সমূহ নিয়ে "স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমবায়" [Sovereign and independent States] গঠনের তাগিদ অবাঞ্ছিত বিবেচিত হলো। পক্ষান্তরে, জাতীয় স্বাধীনতার এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবি সমাজকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। তারা আন্তরিক-ভাবেই বিশ্বাস করেছিল, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা তাদের আত্মবিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করবে, বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে, গণ-মুক্তির প্রথম স্তররূপে জাতীয় মুক্তির পথ প্রশস্ত করবে। তাদের একান্ত প্রত্যয় ছিল, বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সত্বারূপে পাকিস্তান গড়ে তুলতে জাতীয় সার্বভৌমত্বের যে স্বীকৃতি অপরিহার্য, লাহোর প্রস্তাব তা সুনিশ্চিত করেছে। এবং পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করার মূলমন্ত্রও ঐ স্বীকৃতিতে নিহিত।

প্রাচীনপন্থীরা নব্যশক্তির মোকাবিলায় ইতিহাসকে বিকৃত করার মহাজনী পন্থা অবলম্বন করলেন। কালক্ষেপ না করে তাঁরা ঘোষণা করলেন—এক আল্লাহ্, এক কোরান, এক রসুলের অনুসারী মুসলমানদের আবাসভূমি পাকিস্তান হবে এক রাষ্ট্র, এক ভাষা ও

এক সংস্কৃতির দেশ। লাহোর প্রস্তাবের States শব্দের 'S'—কে তাঁরা আখ্যা দিলেন টাইপের ভুল!

লাহোর প্রস্তাবের এই বিকৃত ব্যাখ্যার প্রবক্তারা ভারতের সদ্য বিকাশোন্মুখ মুসলিম অর্থনৈতিক স্বার্থের সক্রিয় সহযোগিতায় বলীয়ান। সুতরাং অধিকতর বেপরোয়া।

এবং এই বেপরোয়া মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ ঘটলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই—প্রথমে রেসকোর্স ময়দানে এবং পরে কার্জন হলের সুধী সমাবেশে।

জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান উপাদান ভাষার অধিকার এবং বোধ করি সেই জন্যই নব্যশক্তিকে স্তব্ধ করার গর্জন শোনা গেলো: "Urdu and Urdu only shall be the State Language of Pakistan". উর্দু'ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪২ সালের ইতিহাসের বিকৃতি পর্যায় থেকে বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনের (১৯৪৭) ঘোষণা পর্যন্তকাল পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তর্নিহিত নব্যশক্তির প্রস্তুতি-পর্ব। কোলকাতা সিটি মুসলিম ছাত্র-লীগ, শহীদ-হাশিম গ্রুপের উদারপন্থী মুসলিম লীগ মহল এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম তরুণ বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন আসন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়ার জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে একটি গণতান্ত্রিক যুব-সংস্থা ও একটি প্রগতি-শীল ছাত্র সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হলো। পরবর্তীকালে জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ [শামসুল হক ও আতাউর রহমানের নেতৃত্বে] এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সাংগঠনিক কমিটি [শেখ মুজিবর ও নঈমুদ্দিনের নেতৃত্বে]।

প্রবীণ চিন্তাধারা ১৫ই আগষ্টের পর যেমন পেলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক শক্তির উৎসাহ, নবীন চিন্তাধারা পেলো সাংগঠনিক শক্তির হাতিয়ার ও উন্নততর আদর্শের বর্ম। ফলে উভয় চিন্তাধারার স্বাধীনতা-পূর্বকালের সুপ্ত দ্বন্দ্ব স্বাধীনতা-উত্তরকালে

সুস্পষ্ট সংকটে রূপান্তরিত হলো। এবং সে-সঙ্কটের গভীরতার অভিব্যক্তি ঘটলো কার্জন হলের সেই সুধী সমাবেশে—'একমাত্র উর্দু'র' আস্ফালন স্তব্ধ হয়ে গেলো বজ্রকণ্ঠের "না" ধ্বনির তরঙ্গাঘাতে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ['৫২] আন্দোলনের পথিকৃত ১১ই মার্চের ['৪৮] আন্দোলন ছিল এই ঐতিহাসিক না-ধ্বনির উত্তাল তরঙ্গ। ঢেউ লাগলো সারা প্রদেশে। স্বাধীনতাকামী জনসমষ্টির যেনো নবযাত্রা শুরু হলো। তরুণ সমাজ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেড়িয়ে এলো রাস্তায়। পুলিশের মুখোমুখী। কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। এরা পাকিস্তানের নব্যশক্তি। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এরা উপরতলার চক্রান্ত উপেক্ষা ক'রে কোলকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় শান্তি মিছিলে সামিল হয়েছে, বৃটিশ-বিরোধী শ্লোগানে কোলকাতার রাজপথ কাঁপিয়ে তুলেছে, ২৯শে জুলাইয়ের [১৯৪৬] সর্বাত্মক হরতাল সফল করেছে, রশিদ আলী দিবসের যৌথ নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের গতি নির্ণয় করেছে এরা বালুরঘাট উপনির্বাচনে, '৪৫ ও '৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে।

১১ই মার্চ এদের ত্যাগের পরীক্ষা, ঈমানের পরীক্ষা, নবলব্ধ চেতনার অগ্নিপরীক্ষা। এরা জয়ী হলো। চারদিন সংগ্রামের পর।

একদিকে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন, অন্যদিকে সংগ্রাম পরিষদ। ১৫ই মার্চ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। নাজিমুদ্দিন সরকার অঙ্গীকার করলেন, বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা করা হবে এবং দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সরকার সুপারিশ করবেন কেন্দ্রের নিকট।

[এ-আন্দোলনে ছাত্রগণ বন্ধু হিসা'ব পেলেন কতিপয় পরিষদ সদস্য—বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, কুমিল্লার তফাজ্জল আলী, কুষ্টিয়ার ডাঃ আবদুল মোত্তালিব মালিক, রংপুরের খয়রাত হোসেন ও ঢাকার মিসেস আনোয়ারা খাতুন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, প্রথমোক্ত তিন ব্যক্তির দরদ বাংলা ভাষা অপেক্ষা গদীর প্রতিই

অধিক। টি, আলী ও মালিক সাহেব হলেন মন্ত্রী এবং মোহাম্মদ আলী বার্মায় রাষ্ট্রদূত।]

কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। এ-যেন মধ্যপ্রাচ্যের নৃপতিদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের চুক্তি—। লঙ্ঘন করার জন্যই চুক্তি সম্পাদন। শুধু প্রাদেশিক সরকার কেন? নবাবজাদা লিয়াকত আলীর কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার উর্দুর প্রভুত্ব বিধি-সিদ্ধ করার জন্য শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্ট সুপারিশ করলেন—উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা [১৯৫০]। নাজিমুদ্দিনের চুক্তিকে কেন্দ্রীয় কর্তা ব্যক্তিরা দুর্বলতার নামান্তর, "ভারতীয় ও কম্যুনিষ্ট এজেন্টদের" কাছে আত্মসমর্পণের সামিল বলে অভিহিত করলেন।

কিন্তু ১১ই মার্চ বৃথা যায় নি। দমন নীতির চাপে সাময়িকভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা [গণতান্ত্রিক যুবলীগের অকাল মৃত্যু] পরি-লক্ষিত হলেও তরুণ সমাজ তথা সমগ্র প্রদেশবাসীর অধিকার-চেতনা ও সংগ্রামী দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়। ছাত্র-যুবকের আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপক জনতার সংশ্রব ঘনিষ্ঠতর করার তাগিদে ছাত্ররাই মুসলিম লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো [১৯৪৯]। এদিকে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের দরুন মুসলিম লীগের এক অংশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সেই সঙ্গে এগিয়ে এলো পাকিস্তান অবজার্ভার ও দৈনিক ইনসাফ। এগিয়ে এলো, ছাত্র শিক্ষক, সাংবাদিকসহ সকল বুদ্ধিজীবী মহল। মূলনীতি রিপোর্ট-বিরোধী ব্যাপক ভিত্তিক কমিটি গঠিত হলো আন্দোলন পরিচালনার জন্য।

লিয়াকত-রিপোর্ট নাকচ করে বিকল্প রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য এক মহা সম্মেলন [Grand National Convention] আহূত হলো। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন প্রথমে আতাউর রহমান খান ও পরে কমরুদ্দীন আহমদ। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূল কাঠামো

প্রণীত হলো এই সম্মেলনে। ঘোষণা করা হলো, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে, সাড়ে চার কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। পাকিস্তানে বহিরাগত বণিক শ্রেণীর সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিত্তবান ভূস্বামীদের ক্রমবর্দ্ধমান স্বার্থের সংঘাত মুসলিম লীগেও প্রতিফলিত হয়। পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত উন্নত ও অনুন্নত এলাকার মধ্যেও বিরোধ। সর্বোপরি, নব্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ পূর্ব বাংলার প্রতি অবশিষ্ট সকল অঞ্চলের ভীতিমিশ্রিত উপেক্ষা—এ সমস্ত কিছুর ফলস্বরূপ মুসলিম লীগ ক্ষতবিক্ষত। পরিণামে, লিয়াকত আলীর রিপোর্ট একদিকে যেমন পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনমতের পদদলিত, অন্যদিকে নিজ পার্টি মুসলিম লীগ মহলেও অনাদৃত। লিয়াকত-রিপোর্ট প্রত্যাহৃত হলো। বাংলাভাষা বিরোধী আর এক চক্রান্তের মৃত্যু হলো। সঙ্গে সঙ্গে পরাস্ত হলো এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের নামে জাতীয় স্বাধিকার হরণের কারসাজি।

লিয়াকত আলীর পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ফজলুর রহমান ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেন: বাংলাভাষা লেখা হবে আরবী হরফে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা তো দূরের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হবে না। মাথা কেটে মাথা ব্যথা দূর করে দাও—ফজলুর রহমানের সহজ বুদ্ধি [?] অতি সহজেই ছাত্র-জনতার নিকট বোধগম্য হলো। আবার প্রতিরোধ। আবার তাদের পশ্চাদপসরণ।

আরবী-হরফে-বাংলার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ তখনও স্তিমিত হয় নি। ঢাকায় নিখিল পাকিস্থান মুসলিম লীগের অধিবেশন। ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫২। সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। আর ১৯৫২ সালের ২৬শে

জানুয়ারী। মাঝখানে কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক বৎসর আর খাজা নাজিমুদ্দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের সংগ্রামের কথা স্মরণ করলো। আর স্মরণ করলো ১৫ই মার্চের চুক্তিপত্র ও লঙ্ঘন। স্মরণ করল লিয়াকত-রিপোর্ট, ফজলুর রহমানী ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টা।

পাঁচটি বৎসর যেন বৃথা চলে গেছে! এতো প্রতিবাদ, এমন দাবী, কোনও ফল নেই? প্রত্যয় দৃঢ়তর হয় ছাত্র সমাজের। আবার আন্দোলন। অধিকার হরণকারীর বিরুদ্ধে মরণপণ প্রতিরোধ।

মাত্র চারদিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ ধর্মঘটের আয়োজন করে, পুরাতন সংগ্রাম পরিষদকে সক্রিয় করে তোলে এবং ব্যাপক ভিত্তিতে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে।

ঘটনাপঞ্জী

৩০শে জানুয়ারী ছাত্ররা ক্লাশে যোগদানে বিরত থাকে। বিকালে ডিস্ট্রিক্ট বার লাইব্রেরী হলে জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন পরিচালনার জন্য সভায় একটি কমিটি গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ, যুব লীগ, খিলাফতে রব্বানী, ছাত্র লীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি এ কমিটিতে নেয়া হয়। কাজী গোলাম মাহবুব কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। তা'ছাড়া এ কমিটিতে ছিলেন: জনাব আবুল হাসেম, আতাউর রহমান খান, কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, ওলী আহাদ, আবদুল মতিন ও খালেক নওয়াজ খান। [১৯৪৮ সালের আন্দোলনের অন্যতম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তখন জেলে ছিলেন। ১৯৪৯

সালের মার্চ মাস থেকে তিনি জেল খাটছেন। এই কমিটি প্রথম সভাতেই স্থির করে সভা-শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে সারা প্রদেশে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসাবে পালন করা হবে।

এ দিবসের কর্মসূচী স্যফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মঘট পালন, শোভাযাত্রা ও ছাত্র-জনতার মিলিত সভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অর্থ সংগ্রহের জন্য ছাত্ররা ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী পতাকা দিবস ঘোষণা করে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী বিপুল সাফল্যের সাথে পালন করা হলো। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনে নেমে পড়ে। পুলিশ ঐদিন কোন বাধা দেয়নি। সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা ভাসানী ছাত্র-জনতার মিলিত সভায় বক্তৃতা দেন। পতাকা দিবসও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হলো।

১৩ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান অবজার্ভারের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অজুহাতটি ছিল ধর্মীয়। কিন্তু বুঝতে কারো অসুবিধা হয় নি সরকারের উদ্দেশ্য : ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের শক্তিশালী একমাত্র প্রচারযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করার সংগে সংগে সম্পাদক আবদুস সালামকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

[এ সময়ে সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে]।

২০শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হলো। ১৪৪ ধারা ঘোষণার সাথে সাথে সারা শহর উত্তেজনায় থম্ থম্ করতে লাগল। ছাত্ররা বিক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলগুলোতে জরুরী সভা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদও সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে মিলিত হলো।

ইতিমধ্যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করার জন্য জনাব আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদও এক বৈঠকে মিলিত হলো। সভায় আলোচনা চলতে লাগলো। অধিকাংশ সদস্যই পরের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে মত দিলেন। একমাত্র যুবলীগ নেতা ওলি আহাদ যে-কোন পরিস্থিতিতে পূর্ব কর্মসূচী বহাল রাখার পক্ষে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভংগ করার পক্ষে মত দিলেন। ছাত্র প্রতিনিধিগণ তখন ছাত্রাবাসের সভাগুলোতে ব্যস্ত। অন্যরা বললেন: "আমরা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করি তাহলে দেশে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে সরকার জরুরী অবস্থার অজুহাতে সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারে। আমরা সরকারকে সে সুযোগ দিতে চাই না।

কমিটির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নির্বাচন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় বড়ো করে দেখেছেন। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার আগেই "বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজের" মনোভাব জানাতে এলো দুই জন ছাত্র প্রতিনিধি: ছাত্রগণ আগামীকাল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। এটা ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত। এ সম্পর্কে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

ছাত্ররা এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সর্বদলীয় পরিষদের রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন। কমিটি সিদ্ধান্ত করলেন: কমিটির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হক ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার যৌক্তিকতা বুঝাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু ছাত্ররা যদি তা মেনে না নেয় তবে এ-সর্বদলীয় কমিটি তখন থেকেই বিলুপ্ত হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে "বেলতলায়"। তখন ইদানীংকার সর্বজনবিশ্রুত "আমতলা" খ্যাতি ছিল না। এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমবেত হলো। ছাত্র নেতা

গাজিউল হক সে মহতী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। .ছাত্ররা শামসুল হকের বক্তব্য শুনলো, কিন্তু তাঁরা সর্বদলীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মানতে রাজী হল না। তারা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী শোভাযাত্রা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে কড়া পুলিশ পাহারা।

এ সময়ে ছাত্র নেতা আবদুস সামাদ একটি আপোষ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, ছাত্ররা দশ জন, দশ জন করে বের হবে। এটা এক ধরনের সত্যাগ্রহ। প্রস্তাবটির মাহাত্ম্য হলো এই যে, এতে এক দিকে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করা হবে, অপরদিকে ব্যাপক আকারের গোলযোগ এড়ানো সম্ভবপর হবে।

ছাত্ররা এ প্রস্তাব মেনে নিল শেষ পর্যন্ত। দশজন দশজন করে ছাত্ররা বের হতে লাগলো আর পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে লাগল। এইরূপ পরিস্থিতিতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। কাঁদুনে গ্যাসের এক একটি শেল ছাত্রদের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দিল। ফলে শুরু হলো ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। কিছুক্ষণ পর পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ পর নিরস্ত্র ছাত্র আর সশস্ত্র পুলিশের এ খণ্ড যুদ্ধের স্থান বদলে গেল। মেডিকেল কলেজ গেট, মেডিকেল কলেজ হোষ্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোষ্টেল ও তার চারিদিকের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল সংঘর্ষ। এসব স্থানে বেপরোয়া লাঠি চার্জের ফলে বহু ছাত্র আহত হলো।

বেলা তিনটা থেকে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। বাইরে সদস্যের নিকট ছাত্ররা পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ জানায় এই সময়।

আনুমানিক বেলা ৪টার সময় পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টে-লের সামনে গুলী চালায়। গুলীতে জব্বার আর রফিকুদ্দিন প্রাণ দেয়। এদের মধ্যে একজন ছিল নিকটবর্তী একটি হোটেলের 'বয়'।

এরপর ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। এম-এ(রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আবুল বরকত মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের শেডের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল প্রথম গুলীর আওয়াজ শুনে। বুলেট উরুদেশ বিদ্ধ করে। প্রচুর রক্তপাতের পর রাত আটটায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়।

বরকতের মৃত্যুর খবর দাবাগ্নির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পরিষদ ভবনেও বাইরের ঢেউ লাগে। উত্তেজিত পরিষদে খয়রাত হোসেনের মুলতবী প্রস্তাব সমর্থন করেন সরকার পক্ষীয় সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ও সম্পাদক শামসুদ্দিন সাহেব।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন নির্লজ্জভাবে পুলিশের গুলী চালনা সমর্থন করেন। ফলে মওলানা তর্কবাগীশ ও আবুল কালাম শামসুদ্দিন তৎক্ষণাৎ মুসলিম লীগ পার্টি থেকে পদত্যাগ করে খয়রাত হোসেন সহ পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। মিসেস আনোয়ারা খাতুন ও মওলানা তর্কবাগীশ পরে আন্দোলনে যোগ দেন। এবং শামসুদ্দিন সাহেব পরদিন পরিষদ সদস্য পদেও ইস্তেফা দেন।

ওদিকে বিক্ষুব্ধ ঢাকা নগরী ভেঙ্গে পড়ে শোকে। হাজার হাজার মানুষ চলে মেডিকেল কলেজের দিকে। সারা বিকাল, সারারাত জনস্রোতের আর বিরাম নেই। শোকাভিভূত জনতা শ্রদ্ধা জানায় শহীদদের প্রতি। মেডিকেল কলেজ নয়, যেনো তীর্থস্থান।

২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্র-সভার পর সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আর মিলিত হতে পারেনি। ছাত্র-পরিষদের সদস্যরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই তখন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে থাকে। তারা হোস্টেলে কণ্ট্রোল রুম স্থাপন করে এবং সম্ভাব্য পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে কড়া পাহারা দিতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতেও কণ্ট্রোল রুম স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল বেলায় শহীদদের গায়েবী জানাজায়

শরিক হয় কয়েক লক্ষ লোক। এত বড় বিরাট জনসমাবেশ ঢাকায় আর কেউ কখনো দেখে নি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত তিল ধারণের স্থান ছিল না। নাগরিক-জীবন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। জানাজার পর উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এক বিরাট শোভাযাত্রায় সামিল হয়। পুলিশ শোভাযাত্রায় বাধা দেয়। এবং হাইকোর্টের সামনে আবারও গুলী চালায়। ফলে শফিকুর রহমান নামে জনৈক সরকারী কর্মচারী ও আইন ক্লাসের ছাত্র নিহত হয়।

এদিকে সদরঘাট এলাকায় তুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। সেদিনকার 'মর্নিং নিউজে' এ মর্মে এক খবর ছাপা হয় যে, ভারতীয় দালাল আর হিন্দুরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য এ আন্দোলন চালাচ্ছে। [Dhoties roaming Streets—এই ছিল হেড লাইন]। শোভাযাত্রা সহকারে সদরঘাট এলাকা থেকে আগত জনতা এ খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা 'মর্নিং নিউজে' আগুন লাগিয়ে দেয় বলে খবর পাওয়া যায়। তৎকালীন মুসলিম লীগ পত্রিকা 'সংবাদে'রও আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা ছিল। উক্ত শোভাযাত্রা নবাবপুরে পৌঁছলে পুলিশ গুলী বর্ষণ করে। তাতে একজন রিক্শাওয়ালা নিহত হয়।

ঐদিন রেলওয়ে কর্মচারীরা ও রেল ওয়ার্কশপের শ্রমিকেরা কাজ যোগ দেয় নি। ঢাকা রেল ষ্টেশনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীরাও অফিস থেকে বেরিয়ে এসে শোভা-যাত্রায় অংশ গ্রহণ করে।

বিকেল ৩টায় পরিষদের অধিবেশন বসে। কিন্তু সরকারী দল সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অতঃপর বাংলাকে পাকিস্তানের 'সরকারী ভাষা' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়।

* * * * *

এ সময়ে সরকারী মহলে একটি আকর্ষণীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদ ও নুরুল আমীনের বিরোধ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। খাজা সলিমও সুযোগ সন্ধানে ব্যস্ত। আজিজ আহমদ ও খাজা সলিম ঐক্যবদ্ধভাবে নুরুল আমীনের বিরোধিতা করতে থাকেন সেই একই প্রশ্ন তুলে: শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতা।

এ সময়ে করাচীর বিখ্যাত সাংবাদিক জনাব সুলেরী ঢাকায় ছুটে আসেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের এজেন্ট হিসেবে তিনি এখানে এসেছিলেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশারও চেষ্টা করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ২২শে ফেব্রুয়ারীই ছিল আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। ইতি-মধ্যে শহরের অবস্থা শান্ত হয়ে আসে। মাঝে পুলিশ মাত্র একবার নাজিরাবাজারে লাঠি-চার্জ করেছিল। সাধারণতঃ আন্দোলনে ভাঁটা পড়লে গভর্ণমেণ্ট তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ২৩শে তারিখ থেকে সরকারী আক্রমণ নবোদ্যমে আরম্ভ হলো। প্রত্যেক হল থেকে মাইক কেড়ে নেওয়া হলো। ধরপাকড় ব্যাপক।

এ সব সত্ত্বেও মেডিকেলের ছাত্ররা বরকত যেখানে খুন হয়েছিল সেখানে রাতারাতি একটি শহীদ মীনার মির্মাণ করে। শফীকুর রহমানের পিতা সে শহীদ মীনাবের উদ্বোধন করেন। যারা মাতৃভাষাকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশী মূল্যবান বলে মনে করেছিল তাদের স্মৃতিব প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য হাজার হাজার লোক শহীদ মীনারে সমবেত হতে লাগল।

একই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ আবার মিলিত হলো এবং ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ

দিবস হিসেবে ঘোষণা করল। শহরে সাধারণ ধর্মঘট প্রধান কর্মসূচী বলে ঘোষণায় নির্দেশ দেওয়া হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ও শহরের মহিলা সমাজ একবাক্যে পুলিশের গুলী চালনার তীব্র নিন্দা করলেন।

ইতিমধ্যে পুলিশ নিরাপত্তা আইনে আবুল হাশেম, খয়রাত হোসেন, মওলানা তর্কবাগীশ, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে ও গোবিন্দলাল ব্যানার্জী প্রমুখ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে।

মওলানা ভাসানী ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা থেকে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে যান। তাঁকে সেখান থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা জেলে আনা হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী ঘোষণা করা হয়। পুলিশ ছাত্রাবাসগুলোতে হামলা চালায়। বহু সংখ্যক ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে শহীদ মীনার ভেঙ্গে ফেলা হয়।

সরকারের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের ফলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদকে আবার পুনর্গঠনের তাগিদ অনুভব করেন অনেকে। তদনুযায়ী উপস্থিত সদস্যদের এক বৈঠকে ৫ই মার্চ প্রদেশব্যাপী শহীদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আতাউর রহমান খানকে পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ছাত্রদের জোরপূর্বক হল থেকে বের করে দেওয়াহয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী যুব লীগের মোহাম্মদ তোয়াহা ও ওলী আহাদ সহ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। একই রাত্রে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় এজেন্ট ও নাশকতা কাজে লিপ্ত রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের তিনি সাফল্যের সাথে দমন করেছেন।

শহরে ৫ই মার্চের ধর্মঘট আংশিক সাফল্যমাত্র লাভ করে।

শহরে ভাঁটা পড়লেও, জেলা শহরগুলোতে আন্দোলনের অভূতপূর্ব ঢেউ ওঠে। প্রদেশের দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এ ঢেউয়ের কাঁপন লাগে।

এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে দেখা যায়, প্রদেশে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সংগ্রাম পরিষদের জনৈক তরুণ সদস্যের কাছে নুরুল আমীন পরাজয় বরণ করেন।

প্রকৃত বিচারে দেখতে গেলে, এ আন্দোলনের সাফল্যজনক ফল শ্রুতি হলো ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র। কারণ এ শাসনতন্ত্রেই বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ প্রবীণদের এক অংশ এবং নব্য-শক্তির বিরাট অগ্রগতির ফলে এ মহৎকর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সে শাসনতন্ত্র আজ ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির চাকা পিছিয়ে গেছে। কিন্তু কিভাবে এটা ঘটলো? পূর্বপাকিস্তানের তরুণ সমাজকে এ প্রশ্নের যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

একুশের ইতিহাস

কবিরউদ্দিন আহমদ

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ১৯৪৮ সনে ঢাকার অগ্রণী ছাত্র-সমাজ ও সংস্কৃতিবান বুদ্ধিজীবীরা প্রথম আওয়াজ তুলেছিল। তখন থেকেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়! সেদিনও ছাত্র-সমাজ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, সরকারের চূড়ান্ত দমননীতি নেমে এসেছিল তাদের উপর। ছাত্র-জনতার দুর্বার শক্তির সম্মুখে বিশ্বাসঘাতক নাজিমুদ্দিন সরকার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে স্বীকার করে প্রস্তাব পাশ করেছিলেন ও গণপরিষদের কাছে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ সঙ্গে সঙ্গে ভাষা আন্দোলনে ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি দিয়ে এবং অন্যান্য কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করে ঢাকার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের পর প্রায় চার চার বছর কেটে গেছে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবীকে সম্পূর্ণ ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, নাজিমুদ্দিন সরকার তার নিজের প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ করেছে। লীগ সরকারের এমনি বিশ্বাসঘাতকতাই জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।

২৬শে জানুয়ারী

পাকিস্তানের রাজনৈতিক আবর্তের প্রবাহচক্রে নাজিমুদ্দিন

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সনের পূর্ববঙ্গ সফর-কালে ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি পুনরায় নির্লজ্জের মতো "উর্দু ই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে" বলে ঘোষণা করলেন। এই বক্তৃতা প্রদেশের অসন্তোষ ভরা জনমনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে। ঢাকায় এবং প্রদেশের সর্বত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে সংগঠিত প্রতিবাদ উঠতে লাগলো দিকে দিকে।

৩০শে জানুয়ারী

নাজিমুদ্দিনের স্বৈরাচারী ঘোষণার প্রতিবাদে ঢাকার ছাত্র-সমাজ সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলো। ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রসভা করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে সামগ্রিক কণ্ঠে পুনরুত্থাপন করল। এই পুনরুত্থাপনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল "বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি"। ১৯৪৮ সনের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের নির্যাতিত ছাত্রকর্মীরা নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে ভাষা আন্দোলনকে জীইয়ে রাখার জন্যে জনাব আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে "বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি" গঠন করে। এই রাষ্ট্রভাষা কমিটিই প্রতিবৎসর ১১ই মার্চ "রাষ্ট্রভাষা দিবস" উদ্‌যাপন করত এবং এই কমিটিই ১৯৬২ সনের ভাষা আন্দোলনকে প্রথম সংগঠিত রূপ দেয়।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ

সেই ৩০শে জানুয়ারী বৈকালে বার লাইব্রেরী হলে ঢাকার ছাত্র বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করে একটি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী

এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হবার পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর এক সুদীর্ঘ মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। বৈকালে কর্মপরিষদের উদ্যোগে এক জনসভা হয়। সভায় জননেতা মওলানা ভাসানী, আবুল হাশেম ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতারা লীগ সরকারের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার তীব্র নিন্দা করেন এবং বাংলা ভাষার দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেই দিনই ২১শে ফেব্রুয়ারী অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে সারা প্রদেশ-ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তুতি

৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাধারণ ধর্মঘটের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচার প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকার রাজনৈতিক আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে সমগ্র প্রদেশের জনমনে তখন বিক্ষোভের আগুন জ্বলতে থাকে। স্বরাজোত্তর কালে সরকার বিভিন্ন উৎপীড়ন নীতির মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে যে প্রাণধ্বংসী ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা সৃষ্টি করেছে, তারই প্রত্যক্ষ আঘাতের ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি খুলে গেছে, অন্ধ মোহ কেটে গেছে। এমনি পরিস্থিতিতে ভাষার কণ্ঠরোধ করার নতুন ষড়যন্ত্র তাদের অসন্তোষকে দ্বিগুণতর করে দিয়েছে। সমগ্র প্রদেশ তখন প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে, দিন দিন অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারীর জন্য জনসাধারণের ধর্মঘটের প্রস্তুতি অন্যদিকে ঐদিনই পূর্ব বঙ্গ সরকারের বাজেট অধিবেশন।

গণ-শক্তির ভয়-ভীতু সরকার নিজেদের অসহায় মনে করে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি থেকে ক্রমাগত এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ধর্মঘট, সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করল।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা শহরের আবহাওয়ায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। রিক্সাওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, দোকানদার থেকে শুরু করে ছাত্র, কেরানী, অফিসার ও রাজনৈতিক মহল পর্যন্ত সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হলো। সকল মহলেই ১৪৪ ধারার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সারা শহরময় একটা থম্‌থমে ভাব বিদ্যমান হয়।

একদিকে চূড়ান্ত সরকারী দমননীতি অন্যদিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ। এমতাবস্থায় কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের" এক জরুরী সভা বসে। সঙ্গে সঙ্গে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্ররা এক জরুরী বৈঠকে সমবেত হয়ে পরিস্থিতির ব্যাপক পর্য্যালোচনা করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংগ্রামের কৌশল নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। জনাব ওলি আহাদ পরিস্থিতির সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিলেন যে, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনে অগ্রসর না হলে ভাষা আন্দোলনের এখানেই অনিবার্য মৃত্যু ঘটবে, আর সরকারী দমননীতির নিকট বশ্যতা স্বীকার করা হবে ও জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ইতিমধ্যেই সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রদের সভা থেকে দুইজন প্রতিনিধি সর্বদলীয় কর্মপরিষদের সভায় এসে উক্ত হলের ছাত্র সাধারণের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সর্বসম্মত অভিমত জানিয়ে দেয়। এতদসত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারী দমননীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন এবং অবশেষে ১১—৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সঙ্গে

সঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যদি ছাত্র ও জনসাধারণের কোন অংশ সর্বদলীয় কর্মপরিষদের এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলন চালিয়ে যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই এই সর্বদলীয় কর্মপরিষদ বাতিল হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হবে।

২১শে ফেব্রুয়ারী ঃ

এই দিন সকাল থেকেই শহরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা চরম ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। প্রবল প্রচার কার্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আগে থেকেই ধর্মঘটের অনুকূলে মনোভাব সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কর্মীদের ইঙ্গিতেই শহরের সকল অঞ্চলের দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, যানবাহন, স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেলা ১২ টার মধ্যে সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে হাজির হলো। প্রায় সাড়ে ১২টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জনাব গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক জনাব আবদুল মতিন আন্দোলনের পূর্বাপর পর্যায় ও ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভুত বিশেষ সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করলেন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মতামতের উপরেই ১৪৪ ধারা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন।

তখনই সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের পক্ষ থেকে জনাব শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাবার জন্য বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু আন্দোলন সম্পর্কিত ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি তাঁর সহকর্মিগণ সহ সভা থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। অতঃপর ব্যাপকতম পর্যালো-চনার পর ভাষার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিস্থিতির মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ছাত্ররা সুদৃঢ় আত্ম-

চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে সংহত অভিমত ঘোষণা করে।

সঙ্গে সঙ্গে সভা ভঙ্গ করে "দশজনী মিছিল" বের করার জন্য ছাত্ররা শ্লোগান দিতে দিতে গেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। গেটের বাইরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল আই, বি ও পুলিশ-বাহিনী। ছাত্রদের প্রথম 'দশজনী মিছিল' শ্লোগান দিয়ে বের হতেই পুলিশ এসে গ্রেফতার কবে তাদের ট্রাকে ভর্তি করে রাখে। দেখতে দেখতেই ছাত্র গ্রেফতার করে অনেকগুলি ট্রাকে ভরে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এত গ্রেফতারের পরও ছাত্রদের দমন করতে না পেরে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ল রাস্তাব পাশে আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উপর্যুপরি কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ার পর ছাত্ররা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিতে থাকে। অনেকেই তখন কাঁদুনে গ্যাসে আহত হয়ে পড়ে রইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। ছাত্ররা তখন উত্তেজনা আর যন্ত্রণায় অধিকতর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

প্রায় বেলা ২টা পর্যন্ত মিছিল করে ছাত্ররা বীরত্বের সঙ্গে গ্রেফতারী বরণ করতে থাকে। তখন ধীরে ধীরে ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজে হোষ্টেলে, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গেটে গিয়ে জমায়েত হতে থাকে। দলবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিয়ে বের হতেই উদ্ধত পুলিশ বাহিনী এসে তাড়া করে। বেলা প্রায় সোয়া তিনটার সময় এম, এল, এ ও মন্ত্রীরা মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে পরিষদে আসতে থাকে! ছাত্ররা যতই শ্লোগান দেয় আর মিছিলে একত্রিত হয় ততই পুলিশ হানা দেয়। কয়েকবার ছাত্রদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে তাড়া করতে করতে মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেলের ভেতর ঢুকে পড়ে! হোষ্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে ছাত্রদের উপর আক্রমণ করায় ছাত্ররা বাধ্য হয় ইট-পাটকেল ছুঁড়তে। একদিকে ইট-পাটকেল আর অন্যদিক থেকে তার পরিবর্তে কাঁদুনে গ্যাস আর

লাঠি-চার্জ আসে। পুলিশ তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য করে গুলী চালায়। ঘটনাস্থলেই আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহম্মদ শহীদ হন। আর ১৭ জনের মত গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে সরানো হয়। তাঁদের মধ্যে রাত আটটার সময় আবুল বরকত শহীদ হন।

গুলীচালনার সাথে সাথেই পরিস্থিতির অচিন্তনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। তখন ছাত্র-ছাত্রীদের চোখে-মুখে যেন ক্রোধ আর প্রতিহিংসার আগুন ঝরে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের মাইক দিয়ে তখন পুলিশী হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। আইন পরিষদের সদস্যদের প্রতি ছাত্রদের উপর গুলী চালাবার প্রতিবাদে অধিবেশন বর্জন করার দাবী জানান হয়। ১৪৪ ধারার নাম-নিশানাও তখন আর পরিলক্ষিত হয় না। গুলীচালনার সংবাদ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে শহরের প্রান্তে প্রান্তে। তখনই অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়েট, বেতার কেন্দ্রের কর্মচারীরা অফিস বর্জন করে বেরিয়ে আসে। শহরের সমস্ত লোক তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে মেডিক্যাল হোষ্টেল প্রাঙ্গণে এসে হাজির হতে থাকে। রাস্তায় আর অলিতে-গলিতে যেন ঢাকার বিক্ষুব্ধ মানুষের ঝড় বয়ে চলে প্রবলবেগে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ব্যারাকে ব্যারাকে শহীদদের রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। মাইক দিয়ে তখন শহীদানের নাম-ঠিকানা ঘোষণা করা হয়। সমস্ত মানুষের মন থেকে যেন তদমুহূর্তেই সমস্ত ভয়, ত্রাস মুছে গেছে, চোখে মুখে সমস্ত প্রাণশক্তি দিয়ে বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ প্রকাশিত হয়ে উঠেছে!

বাইরের এমনই তুমুল পরিস্থিতির ঢেউ এসে লেগেছে পরিষদ কক্ষে। পরিষদের বিরোধী দলের সদস্যরা নুরুল আমিনের কাছে ছাত্রদের উপর গুলীচালনার কৈফিয়ৎ দাবী করেন এবং পরিষদ মুলতুবি রাখার দাবী জানান। নুরুল আমিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, "কয়েকজন ছাত্র গুরুতর রূপে আহত হয়েছে শুনে আমি ব্যথিত

হয়েছি। আমাদেরকে ভাবাবেগে চালিত হলে চলবে না।” পরিষদ কক্ষেই এমনি জঘন্য মনোবৃত্তির তীব্র প্রতিবাদ উঠলো। লীগ পরিষদ দলের জনাব তর্কবাগীশ বলে উঠলেন, “আমাদের ছাত্রগণ যখন শাহাদাত বরণ করছেন তখন আমরা আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব তা আমি বরদাশত করব না।”—এই বলেই তিনি পরিষদ কক্ষ বর্জন করে এসে ছাত্রদের মাইকে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ও আন্দোলনের সপক্ষে বক্তৃতা করলেন।

রাত্রে সান্ধ্য আইন আর ১৪৪ ধারার বিন্দুমাত্র চিহ্নও কোথাও রইল না। শহর আর শহরতলির হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ সেই রাত্রে মেডিক্যাল হোষ্টেল প্রাঙ্গণ দেখতে আসে। দেখে মনে হল যারা শহীদ হলো তারা যেন মৃত্যুহীন, তারা যেন বাংলার সকল ধর্মের সকল মতের মানুষের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে এই বধ্যভূমিকে।

২২শে ফেব্রুয়ারী ঃ

এই দিন ভোর থেকেই সলিমুল্লাহ্ হল, মেডিক্যাল কলেজ, ফজলুল হক হল, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, জগন্নাথ কলেজের মাইকগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল কর্মী আর ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ সাধনের জন্য আহ্বান জানান হয়।

সকাল বেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল ৩ জন নিহত, ৩০০ জন আহত ও ১৮০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ছাত্রদের উপর গুলী চালনার সংবাদ শুধু শহরেই নয়, দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের সমস্ত দোকান-পাট, গাড়ী-ঘোড়া, অফিস-আদালত, যান-বাহন বন্ধ করে শ্রমিক-মজুর-কেরানী ও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে এগিয়ে এসেছে। শহীদদের লাসগুলিকে চক্রান্ত করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের ভেতর ‘গায়েবী

জানাজা' পড়া হলো। এদিন সমস্ত শহর মিলিটারীর হাতে দেয়া হয়েছে। তবুও দেখতে দেখতে অসংখ্য মানুষ জানাজায় এসে শরিফ হলেন। ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন, "হে আল্লাহ, আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই তুনিয়ার বুক থেকে।"

জানাজা শেষে জনসাধারণকে নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ওলি আহাদ পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার ও কর্মপন্থা ঘোষণা করে বক্তৃতা করলেন। তার মুখ থেকে এক একটি কথা যেন আগুনের ফুলকির মত বেরুল। সভা শেষ করেই লক্ষাধিক জনতার মিছিল বেরোয়। শোভাযাত্রার মধ্যখানে হঠাৎ লাঠি চার্জ করার পরও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে না পেরে গুলী চালায়। এখানেই হাইকোর্টের কেরানী সফিউর রহমান শহীদ হন। ছত্রভঙ্গ জনতা তখন হাইকোর্ট আর কার্জন হলের দিকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শোভাযাত্রার প্রথম অংশ তবুও স্টেশন ও নবাবপুর হয়ে এগুতে থাকে। শোভাযাত্রার এই অংশ সদরঘাট এলে পুনরায় তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হয়। অনেকেই আহত হয়ে পড়ে রইলো রাস্তার তু'পাশে। মিছিল মিটফোর্ড হয়ে চক্‌বাজার দিয়ে মেডিক্যাল হোষ্টেলে গিয়ে শেষ হয়।

অন্যদিকে সকাল ৯টায় জনসাধারণের এক বিরাট অংশ 'মর্নিং নিউজ' অফিস জ্বালিয়ে দেয় এবং 'সংবাদ' অফিসের দিকে যেতে থাকে। সংবাদ অফিসের সম্মুখে মিছিলের উপর মিলিটারী বেপরোয়া গুলী চালায়। অনেকেই হতাহত হয় এখানে।

এই দিন জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা বের করে আর ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। গ্রাম থেকে গাড়ীওয়ালা, মাঝি-মাল্লা আর কৃষক-মজুর-ছাত্র-শিক্ষকরা

এসে শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। সমস্ত অফিস-আদালত, কারখানা, স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট, যানবাহন বন্ধ করে তারা মিছিলে যোগ দিয়েছে। শহরের সকল প্রান্ত থেকে জনসাধারণ নিজেরাই মিছিল সংগঠিত করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রেলওয়ে কারখানায় ধর্মঘট ঘোষিত হয়েছে। কারখানার শ্রমিকরাই রেলের চাকা বন্ধ করতে এগিয়ে এসেছে। প্রায় ১১টা পর্যন্ত রেল চলাচল একদম বন্ধ থাকে। সব দিক থেকে ব্যাপকতম ধর্মঘটের চাপে সরকার সেদিন বিকল হয়ে পড়েছিল। তারই চাপে পড়ে সেদিন পরিষদে লীগ সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ও তার জন্যে গণপরিষদের কাছে সুপারিশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন গুলী চালনার প্রতিবাদে লীগ পার্লামেণ্টারী দল বর্জন করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ঃ

গত দুই দিন ধরে পুলিশ-মিলিটারী নিরস্ত্র জনতার উপর বেপরোয়া গুলী চালিয়েছে। শহীদদের লাশগুলি নিয়ে পর্যন্ত সরকার ছিনিমিনি খেলেছে। লাশগুলি কোথায় নিয়ে গেছে তার হদিসই মেলে না। জনসাধারণের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—তাদের মনের ক্ষত আরও দ্বিগুণতর হয়ে গেল। শহীদদের লাশ নিয়ে এ দুর্ব্যবস্থা দেখে 'দৈনিক মিল্লাত' সেদিন সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলল, "ইসলামী বিধান অনুসারে মুসলমানের লাশ অতি পবিত্র এবং অত্যন্ত তাজিমের সহিত দাফন কার্য সম্পন্ন করা বিধেয়। কিন্তু দুই দিনের পুলিশ জুলুমের ফলে শাহদাতপ্রাপ্ত লাশগুলি ইহাদের অভিভাবকদের দেওয়া হয় নাই। শরিয়ত মোতাবেক তাহাদের শেষকৃত্য যদি সমাপন না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সরকারকে গোনাহের ভাগী হইতে হইবে। ইসলামী রাষ্ট্র বলিয়া জাহির করার পরও পাকিস্তানে এইরূপ ঘটিতে দেওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর।

মুসলমান জনসাধারণের মনের ক্ষতে ইহার দ্বারা লবণের ছিটা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইতে পারে।”

সকালবেলা সংবাদপত্রে দেখা গেল ৫ জন নিহত, ১২৫ জন আহত ও ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রদেশের সর্বত্র ঢাকার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে। ধর্মঘট, সভা-শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে সর্বত্র গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হচ্ছে। সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে জেলায় জেলায়।

ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়েছে এদিনও। নিরস্ত্র জনতার উপর নাজিরাবাজার ও ষ্টেশনে লাঠিচার্জ করে। মেডিক্যাল হোষ্টেলের মাইকটি মিলিটারী এসে জোবপূর্বক দখল করে নিয়ে যায়।

মেডিক্যাল হোষ্টেলের গেটের পার্শ্বেই ছাত্ররা নিজেরাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তোলে। শহীদ সফিউর রহমানের পিতা এই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন করেন। এই দিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদকে আন্দোলন চালানোর জন্য আবার পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। সভায় ৯-দফা দাবী স্থিরীকৃত হয় এবং নুরুল আমিনের জঘন্য মিথ্যা বিবৃতির প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয় আর প্রদেশের ও কেন্দ্রের আন্দোলনে যোগসাধনের জন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয়।

ঢাকায় মানুষকে এক একটি মাইকের সম্মুখে বসে বসে সারা দিন বক্তৃতা শুনতে দেখা যায়। রাত্রে আজিমপুরা কলোনীর মেয়েরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় যোগদানের জন্য সুদূর কমলাপুর থেকে মেয়েরা আসতে থাকে। কয়েক হাজার মহিলা এই প্রতিবাদ সভায় একত্রিত হয়ে সবকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান।

২৪শে ফেব্রুয়ারী :

যতই সরকার দমননীতি চালাচ্ছিল ততই জনসাধারণ

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে ৪দিন তুমুল আন্দোলন চলেছে ঢাকা শহরে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষ এসে যোগ দিয়েছে এই প্রতিরোধ আন্দোলনে। সমস্ত অফিস-আদালত, কল-কারখানা, যান-বাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। এক মিলিটারী ছাড়া আর কোন শক্তিই তখন সরকারের হাতে ছিলনা। প্রত্যেকটি মুহূর্তেই সরকারের পতনের আশঙ্কা ছিলো। এমনি পরিস্থিতি দেখে গভর্নর অনন্যোপায় হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর গুলী চালানোর জন্য তীব্র নিন্দা করেন এবং তারই প্রতিবাদে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মিলিটারী বাহিনী ফজলুল হক হল, জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সলিমুল্লাহ হলের মাইকগুলি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সলিমুল্লাহ হলের পশ্চিম দিকস্থ দরজা ভেঙ্গে মিলিটারী বাহিনী প্রায় ৮০ জনের মত কর্মীকে গ্রেফতার করে এবং সলিমুল্লাহ্ হলের ভিতরে আন্দোলনকারীদের যে সেক্রেটারিয়েট বসেছিল তার সমস্ত কাগজপত্র হস্তগত করে নেয়। সন্ধ্যাবেলা মেডিক্যাল হোস্টেলের স্মৃতি স্তম্ভটি মিলিটারী এসে ভেঙ্গে ফেলে।

জটিলতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে সর্বদলীয় কর্মপরিষদ আবার সভা আহ্বান করে। সরকারকে ৭৫ ঘণ্টার চরমপত্র দেয়া হয় এবং ৫ই মার্চ প্রদেশব্যাপী "শহীদ দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আর আন্দোলনে সর্বমোট ৩৯ জন শহীদ হয়েছেন বলে দাবী করা হয়। ৯-দফা দাবীর ভিত্তিতে সরকারের নিকট নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন দাবী করা হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী :

আন্দোলনের চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হল পরিত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে নির্দেশ দেন। তখন আন্দোলনের সমস্ত প্রচারযন্ত্র সরকার কেড়ে নিয়েছে। আন্দোলনকারীদের উপর একপক্ষ আক্রমণের ফলে চরম সন্ত্রাসের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল সারা শহরময়। দেখতে দেখতেই আন্দোলনের মূল ৯ জন কর্ম-কর্তাদের উপর প্রকাশ্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গেল। সরকার যথেচ্ছা গ্রেফতার শুরু করল ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীদের। সংবাদ পত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে সুর বদলিয়ে আন্দোলনকারীদের রাষ্ট্রের শত্রু বলে আখ্যা দিতে লাগল। শহরে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ফলে আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই আপাততঃ স্তব্ধ হয়ে গেল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ঃ

রাত্রে পুলিশ এক বাড়ীতে হানা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ৯জন আত্মগোপনকারী নেতার মধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার করে নেয়।

৫ই মার্চ ঢাকা শহরে শহীদ দিবস সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। অসংখ্য মিলিটারী সারা শহরের অলি-গলি বেষ্টন করে রেখেছিল। তবে মফস্বলে ৫ই মার্চ শহীদ দিবস পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

সরকার সারা প্রদেশের দাবীকে অস্বীকার করতে না পেরে এক ভুয়া তদন্ত কমিশন বসান। কিন্তু যেহেতু আন্দোলনের নেতাদের বন্দী করে রেখে সরকারী লোক দিয়েই সে কমিশন গঠিত হয়েছিল, সেই জন্য সর্বদলীয় কর্ম-পরিষদ তা বর্জন করে। ভাষা আন্দোলন এমনি চূড়ান্ত সরকারী দমননীতির চাপে আপাততঃ স্তব্ধ হয়ে গেলেও প্রদেশের জনসাধারণ তাকে ভোলেনি। তার প্রমাণ ১৯৫৩ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক সাফল্য। সারা প্রদেশের মানুষ এই দিন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সনের হত্যা-

কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং তদপরবর্তী গণ-আন্দোলনের ধারা তারই সাক্ষ্য বহন করে।

ভাষা আন্দোলনে ধৃত সকল রাজবন্দী অবিলম্বে ছেড়ে দেবেন বলে সরকার কর্তৃক বার বার করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, জনাব ওলি আহাদ, জনাব তোয়াহা, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী ও অধ্যাপক অজিত গুহকে দীর্ঘদিন কারাভোগ করতে হয়। একুশে ফেব্রুয়ারীর ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ তাদের শত্রু-গোষ্ঠীর চেহারা চিনে নিয়েছে। বীর শহীদরা প্রত্যেকটি মানুষের মনে এক একটি স্মৃতিস্তম্ভ। এই স্মৃতিস্তম্ভই সকল প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ধ্বংস করে নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের দুর্জয় প্রেরণার সঞ্চার করেন। [মার্চ, ১৯৫৩]

———